

# বাংলা

ক kka	ক্ট kṭa	ক্‌ kta	ক্ব kba	ক্ম kma	ক্র kra	ক্ল kla	ক্ষ kṣa	ক্শ্ম kṣma
ক্স ksa	গ্ধ gḍha	গ্ন gna	গ্‌ gba	গ্ম gma	গ্ল gla	ঘ্‌ ghna	ঙ্ক nka	উক্ষ rikṣa
জ্‌ ntha	জ্‌ nḡa	জ্‌ nḡha	জ্‌ nḡma	চ্‌ ccha	চ্‌ cchba	ঞ cña	জ্‌ jja	জ্‌ jḡba
জ্‌ jḡha	জ্‌ jḡna	জ্‌ jḡba	ঞ n̄ca	ঞ n̄cha	ঞ n̄jha	ট ṭṭa	ট ṭṭba	ট ṭṭa
ঠ ṭṭha	ড ṇḍa	ণ ṇa	ণ ṇḡa	ত ṭṭa	ত ṭṭba	ত ṭṭha	ত ṭṭa	ত ṭṭa
ত্‌ tma	ত্‌ tra	দ ḍḍa	দ ḍḍha	দ ḍḍba	দ ḍḍbha	ট ṭṭa	ড ṇḍa	ত ṭṭa
ত্‌ ntba	ত্‌ ntra	দ ḍḍa	দ ḍḍha	দ ḍḍa	দ ḍḍba	স ṣa	প ṭṭa	প ṭṭa
প ṭṭa	প ṭṭa	প ṭṭa	প ṭṭa	ফ phla	ত ḡha	ত ḡha	ম ṃna	ম ṃpha
ম ṃba	ম ṃla	ল ṭṭa	ল ḍḍa	ল ḡba	ল ḡla	শ ṣha	ক ṣka	ট ṭṭa
ষ ṣṇa	স্ক skra	স্ট sta	স্ট stra	স্ব sba	হ ḥna	হ ḥma	হ ḥba	হ ḥla

For Group D and other Regional Exam

Copyright © EKDN

# বাংলা ছন্দ

**ছন্দ:** কাব্যের রসঘন ও শ্রুতিমধুর বাক্যে সুশৃঙ্খল ধ্বনিবিন্যাসের ফলে যে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় তাকে ছন্দ বলে। (বাঙলা ছন্দ : জীবেন্দ্র সিংহরায়)

অর্থাৎ, কবি তার কবিতার ধ্বনিগুলোকে যে সুশৃঙ্খল বিন্যাসে বিন্যস্ত করে তাতে এক বিশেষ ধ্বনিসুখমা দান করেন, যার ফলে কবিতাটি পড়ার সময় পাঠক এক ধরনের ধ্বনিমাধুর্য উপভোগ করেন, ধ্বনির সেই সুশৃঙ্খল বিন্যাসকেই ছন্দ বলা হয়।

বিভিন্ন প্রকার ছন্দ সম্পর্কে জানার পূর্বে ছন্দের কিছু উপকরণ সম্পর্কে জেনে নেয়া জরুরি। আর ছন্দ সম্পর্কে পড়ার আগে আরেকটা জিনিস মাথায় রাখা দরকার- ছন্দ সর্বদা উচ্চারণের সাথে সম্পর্কিত, বানানের সঙ্গে নয়।

**অক্ষর :** (বাগযন্ত্রের) স্বল্পতম প্রয়াসে বা এক ঝোঁকে শব্দের যে অংশটুকু উচ্চারিত হয়, তাকে অক্ষর বা দল বলে। এই অক্ষর অনেকটাই ইংরেজি Syllable-র মত। যেমন-

শবরী- শর, বো, রী- ৩ অক্ষর

চিরজীবী- চি, রো, জী, বী- ৪ অক্ষর

কুঞ্জ- কুন, জো- ২ অক্ষর

**ধ্বনি :** কোন ভাষার উচ্চারণের ক্ষুদ্রতম এককই হলো ধ্বনি। ভাষাকে বা ভাষার বাক প্রবাহকে বিশ্লেষণ করলে কতগুলো ক্ষুদ্রতম একক বা মৌলিক ধ্বনি পাওয়া যায়। যেমন- অ, আ, ক্, খ্, ইত্যাদি।

ধ্বনি মূলত ২ প্রকার- স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি।

**স্বরধ্বনি :** ধ্বনি উচ্চারণের সময় মানুষ ফুসফুস থেকে কিছু বাতাস ছেড়ে দেয়। এবং সেই বাতাস ফুসফুস কণ্ঠনালী দিয়ে এসে মুখ দিয়ে বের হওয়ার পথে বিভিন্ন জায়গায় ধাক্কা খেয়ে বা বাঁক খেয়ে একেক ধ্বনি উচ্চারণ করে। যে ধ্বনিগুলো উচ্চারণের সময় এই বাতাস কোথাও বাধা পায় না, বা ধাক্কা খায় না, তাদেরকে স্বরধ্বনি বলে। যেমন, অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ইত্যাদি। এগুলো উচ্চারণের সময় বাতাস ফুসফুস থেকে মুখের বাহিরে আসতে কোথাও ধাক্কা খায় না।

**ব্যঞ্জনধ্বনি :** যে সব ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস থেকে বাতাস মুখের বাহিরে আসার পথে কোথাও না কোথাও ধাক্কা খায়, বা বাধা পায়, তাকে ব্যঞ্জনধ্বনি বলে। যেমন- ক্, খ্, গ্, ঘ্, ইত্যাদি। এই ধ্বনিগুলো উচ্চারণের সময় বাতাস জিহ্বামূল বা কণ্ঠে ধাক্কা খায়। তাই এগুলো ব্যঞ্জনধ্বনি।

**বর্ণ :** বিভিন্ন ধ্বনিকে লেখার সময় বা নির্দেশ করার সময় যে চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তাকে বর্ণ বলে।

**স্বরবর্ণ :** স্বরধ্বনি নির্দেশ করার জন্য ব্যবহৃত বর্ণকে স্বরবর্ণ বলে।

**ব্যঞ্জনবর্ণ :** ব্যঞ্জনধ্বনি নির্দেশ করার জন্য ব্যবহৃত বর্ণকে ব্যঞ্জনবর্ণ বলে।

**হসন্ত বা হলন্ত ধ্বনি :** আমরা যখন ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণ করি, তখন তার শেষে একটি স্বরধ্বনি ‘অ’-ও উচ্চারণ করি। যেমন, ‘ক্’ কে উচ্চারণ করি (ক্ + অ =) ‘ক’। উচ্চারণের সুবিধার জন্য আমরা এই কাজ করি। কিন্তু স্বরধ্বনি ছাড়া ‘ক্’ উচ্চারণ করলে সেটা প্রকাশ করার জন্য ‘ক’-এর নিচে যে চিহ্ন (&) দেয়া হয়, তাকে বলে হস্ / হল চিহ্ন। আর যে ধ্বনির পরে এই চিহ্ন থাকে, তাকে বলে হসন্ত বা হলন্ত ধ্বনি। কোন বর্ণের নিচে এই চিহ্ন দেয়া হলে তাকে বলে হসন্ত বা হলন্ত বর্ণ।

**বাংলা বর্ণমালা :** বাংলা বর্ণমালায় বর্ণ আছে মোট ৫০টি। নিচে বর্ণমালা অন্যান্য তথ্য সহকারে দেয়া হলো-

												পূর্ণমাত্রা	অর্ধমাত্রা	মাত্রাহীন
স্বরবর্ণ	অ	আ	ই	ঈ	উ	ঊ	ঋ	এ	ঐ*	ও	ঔ*	৬	১	৪
ব্যঞ্জনবর্ণ	ক	খ	গ	ঘ	ঙ							২	২	১
	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ							৪	-	১
	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ							৪	১	-
	ত	থ	দ	ধ	ন							৩	২	-

প	ফ	ব	ভ	ম							৪	১	-
য	র	ল									৩	-	-
শ	ষ	স	হ								৩	১	-
ড়	ঢ়	য়	ৎ								৩	-	১
ংঃ		ঁ									-	-	৩
মোট স্বরবর্ণ	১১	মোট ব্যঞ্জনবর্ণ	৩৯	মোট বর্ণ	৫০	পূর্ণ, অর্ধ ও মাত্রাহীন বর্ণ	৩২	৮	১০				

\* এই দুটি স্বরধ্বনিকে দ্বিস্বর বা যুগ্ম স্বরধ্বনি বলে। কারণ, এই দুটি মূলত ২টি স্বরধ্বনির মিশ্রণ। যেমন- অ+ই = ঐ, অ+উ = ঔ বা ও+উ = ঔ। অর্থাৎ, বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনি মূলত ৯টি।

স্বরধ্বনির উচ্চারণের সময় বাতাস ফুসফুস থেকে বের হয়ে কোথাও বাধা পায় না। মূলত জিহবার অবস্থান ও ঠোঁটের বিভিন্ন অবস্থার পরিবর্তনের কারণে বিভিন্ন স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয়। নিচে স্বরধ্বনির উচ্চারণ একটি ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো-

জিহবার অবস্থান	জিহ্বা সামনে আগাবে ঠোঁটের প্রসারণ ঘটবে	জিহ্বা শায়িত অবস্থায় ঠোঁট স্বাভাবিক/ বিবৃত	জিহ্বা পিছিয়ে আসবে ঠোঁট গোলাকৃত হবে
উচ্চ	ই ঈ (উচ্চসম্মুখ স্বরধ্বনি)		উ ঊ (উচ্চ পশ্চাৎ স্বরধ্বনি)
উচ্চমধ্যে	এ (মধ্যাবস্থিত সম্মুখ স্বরধ্বনি)		ও (মধ্যাবস্থিত পশ্চাৎ স্বরধ্বনি)
নিম্নমধ্যে	অ্যা (নিম্নাবস্থিত সম্মুখ স্বরধ্বনি)		অ (নিম্নাবস্থিত পশ্চাৎ স্বরধ্বনি)
নিম্নে		আ (কেন্দ্রীয় নিম্নাবস্থিত স্বরধ্বনি, বিবৃত ধ্বনি)	

**যৌগিক স্বরধ্বনি :** পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনি থাকলে তারা উচ্চারণের সময় সাধারণত একটি স্বরধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়ে থাকে। পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনি একটি স্বরধ্বনি রূপে উচ্চারিত হলে মিলিত স্বরধ্বনিটিকে বলা হয় **যৌগিক স্বর, সন্ধিস্বর, সাক্ষ্যক্ষর বা দ্বি-স্বর**।

বাংলা ভাষায় **যৌগিক স্বর মোট ২৫টি**। তবে **যৌগিক স্বরবর্ণ মাত্র ২টি- ঐ, ঔ**। অন্য যৌগিক স্বরধ্বনিগুলোর নিজস্ব প্রতীক বা বর্ণ নেই।

**ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ**

উচ্চারণ অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো অনেকগুলো ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

**স্পর্শ ব্যঞ্জন :** ক থেকে ম পর্যন্ত প্রথম ২৫ টি ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারিত হওয়ার সময় ফুসফুস থেকে বের হওয়া বাতাস মুখগহবরের কোন না কোন জায়গা স্পর্শ করে যায়। এজন্য এই ২৫টি বর্ণকে বলা হয় **স্পর্শধ্বনি বা স্পৃষ্টধ্বনি**।

**অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ ধ্বনি :** যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় নিঃশ্বাস জোরে সংযোজিত হয় বা ফুসফুস থেকে বের হওয়া বাতাসের জোর বেশি থাকে, তাকে মহাপ্রাণ ধ্বনি বলে। আর যে ধ্বনিগুলোতে বাতাসের জোর কম থাকে, নিঃশ্বাস জোরে সংযোজিত হয় না, তাদেরকে মহাপ্রাণ ধ্বনি বলে। ক, গ, চ, জ- এগুলো অল্পপ্রাণ ধ্বনি। আর খ, ঘ, ছ, ঝ- এগুলো মহাপ্রাণ ধ্বনি।

**ঘোষ ও অঘোষ ধ্বনি :** যে সকল ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হয়, অর্থাৎ গলার মাঝখানের উঁচু অংশে হাত দিলে কম্পন অনুভূত হয়, তাদেরকে ঘোষ ধ্বনি বলে। আর যে সব ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হয় না, তাদেরকে অঘোষ ধ্বনি বলে। যেমন, ক, খ, চ, ছ- এগুলো অঘোষ ধ্বনি। আর গ, ঘ, জ, ঝ- এগুলো ঘোষ ধ্বনি।

**উষ্মধ্বনি বা শিশধ্বনি :** শ, ষ, স, হ- এই চারটি ধ্বনি উচ্চারণের শেষে যতক্ষণ ইচ্ছা শ্বাস ধরে রাখা যায়, বা শিশু দেয়ার মতো করে



উচ্চারণ করা যায়। এজন্য এই চারটি ধ্বনিকে বলা হয় ঊষ্মধ্বনি বা শিষ্মধ্বনি। এগুলোর মধ্যে শ, ষ, স- অঘোষ অল্পপ্রাণ, হ- ঘোষ মহাপ্রাণ।

(বিসর্গ) : অঘোষ ‘হ’-র উচ্চারণে প্রাপ্ত ধ্বনিই হলো ‘ঃ’। বাংলায় একমাত্র বিস্ময়সূচক অব্যয়ের শেষে বিসর্গ ধ্বনি পাওয়া যায়। পদের মধ্যে ‘ঃ’ বর্ণটি থাকলে পরবর্তী ব্যঞ্জনের উচ্চারণ দুইবার হয়, কিন্তু ‘ঃ’ ধ্বনির উচ্চারণ হয় না।

**কম্পনজাত ধ্বনি- র :** ‘র’ ধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বার অগ্রভাগ কম্পিত হয়, বা কাঁপে এবং দন্তমূলকে কয়েকবার আঘাত করে ‘র’ উচ্চারিত হয়। এজন্য ‘র’-কে বলা হয় কম্পনজাত ধ্বনি।

**তাড়নজাত ধ্বনি- ড ও ঢ :** ‘ড’ ও ‘ঢ’ উচ্চারণের সময় জিহ্বার অগ্রভাগের নিচের দিক বা তলদেশ ওপরের দাঁতের মাথায় বা দন্তমূলে দ্রুত আঘাত করে বা তাড়না করে উচ্চারিত হয়। এজন্য এদেরকে তাড়নজাত ধ্বনি বলে। মূলত ‘ড’ ও ‘র’ দ্রুত উচ্চারণ করলে যে মিলিত রূপ পাওয়া যায় তাই ‘ড়’ এর উচ্চারণ। একইভাবে ‘ঢ’, ‘ঢ’ ও ‘র’-এর মিলিত উচ্চারণ।

**পার্শ্বিক ধ্বনি- ল :** ‘ল’ উচ্চারণের সময় জিহ্বার অগ্রভাগ উপরের দাঁতের মাথায় বা দন্তমূলে ঠেকিয়ে জিহ্বার দু’পাশ দিয়ে বাতাস বের করে দেয়া হয়। দু’পাশ দিয়ে বাতাস বের হয় বলে একে পার্শ্বিক ধ্বনি বলে।

**আনুনাসিক বা নাসিক্য ধ্বনি : ঙ, ঞ, ণ, ন, ম-** এদের উচ্চারণের সময় এবং ং, ঁ কোন ধ্বনির সঙ্গে থাকলে তাদের উচ্চারণের সময় মুখ দিয়ে বাতাস বের হওয়ার সময় কিছু বাতাস নাক দিয়ে বা নাসারন্ধ্র দিয়েও বের হয়। উচ্চারণ করতে নাক বা নাসিক্যের প্রয়োজন হয় বলে এগুলোকে বলা হয় আনুনাসিক বা নাসিক্য ধ্বনি।

**পরশ্রয়ী বর্ণ : ং, ঃ, ঐ** - এই তিনটি বর্ণ যে ধ্বনি নির্দেশ করে তারা কখনো স্বাধীন ধ্বনি হিসেবে শব্দে ব্যবহৃত হয় না। এই ধ্বনিগুলো অন্য ধ্বনি উচ্চারণের সময় সেই ধ্বনির সঙ্গে মিলিত হয়ে উচ্চারিত হয়। নির্দেশিত ধ্বনি নিজে নিজে উচ্চারিত না হয়ে পরের উপর আশ্রয় করে উচ্চারিত হয় বলে এই বর্ণগুলোকে পরশ্রয়ী বর্ণ বলে।

নিচে স্পর্শধ্বনির (ও অন্যান্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধ্বনি) একটি পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা ছক আকারে দেয়া হলো-  
উল্লেখ্য, কণ্ঠ্য ধ্বনিকে জিহ্বামূলীয় এবং মূর্ধন্য ধ্বনিকে দন্তমূল প্রতিবেষ্টিত ধ্বনিও বলে।

**অন্তঃস্থ ধ্বনি :** য, র, ল, ব- এদেরকে অন্তঃস্থ ধ্বনি বলা হয়। তবে অন্তঃস্থ ‘ব’ এখন আর বর্ণমালায় নেই, এবং এখন আর এটি শব্দে স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয় না। তবে ব্যাকরণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিশেষত সন্ধিতে এর প্রয়োগ দেখা যায়।

কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ যুক্তবর্ণ

ক+ত = ক্ত	জ+ঞ = জ্ঞ	ত+ত = ত্ত	ন+থ = ন্থ	র+উ = রু	ষ+ম = ঞ্ম	হ+উ = হু
ক+ষ = ক্ষ	ঞ+জ = জ্ঞ	ত+থ = ত্থ	ন+থ = ন্থ	র+উ = রু	ষ+ণ = ঞ্ণ	হ+ঞ = হু
ক+য = ক্য	ঞ+চ = ঞ্চ	ত+ম = ত্ম		র+ধ = র্ধ	স+র = স্র	হ+ব = হ্র
ক+র = ক্র	ঞ+ছ = ঞ্ছ	ত+র = ত্র	ব+থ = ব্থ	ল+ল = ল্ল	স+ন = স্ন	হ+ণ = হু
গ+উ = গু	ট+ট = টু	ত+র+উ = ত্রু	ভ+র = ভ্র		স+ব = স্ভ	হ+ন = হু
ঙ+গ = ঙ্গ	ণ+ড = ণ্ড	দ+য = দ্য	ভ+র+উ = ভ্রু	শ+উ = শু	স+ত = স্ত	হ+ম = হ্ম
ঙ+ক = ঙ্ক		দ+ম = দ্ম	ম+ব = ম্ভ	শ+র+উ = শ্রু	স+য = স্য	
		দ+ধ = দ্ধ		শ+র+উ = শ্রু	স+থ = স্থ	

## বাক্যের শ্রেণীবিভাগ

বাক্যের প্রকাশভঙ্গির ভিত্তিতে বাক্যকে ৫ ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

**বিবৃতিমূলক বাক্য :** কোন কিছু সাধারণভাবে বর্ণনা করা হয় যে বাক্যে, তাকে বিবৃতিমূলক বাক্য বলে। বিবৃতিমূলক বাক্য ২ প্রকার।

**ক) অস্তিত্বাচক বাক্য/ হ্যাঁ বাচক বাক্য :** যে বাক্যে সমর্থনের মাধ্যমে কোন কিছু বর্ণনা করা হয়, তাকে অস্তিত্বাচক বাক্য বা হ্যাঁ বাচক বলে।



যে বাক্যে হাঁ বাচক শব্দ থাকে, তাকে হাঁ বাচক বা অস্তিবাচক বাক্য বলে।

যেমন- তুমি কালকে আসবে।

আমি ঢাকা যাব।

[সদর্থক বা অস্তিবাচক বাক্য : এতে কোনো নির্দেশ, ঘটনার সংঘটন বা হওয়ার সংবাদ থাকে। যেমন :

বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কা জিতেছে।

আজ দোকানপাট বন্ধ থাকবে।

ভাষা অনুশীলন; হৈমন্তী]

খ) নেতিবাচক বাক্য/ না বাচক বাক্য : যে বাক্যে অসমর্থনের মাধ্যমে কোন কিছু বর্ণনা করা হয়, তাকে নেতিবাচক বাক্য বা না বাচক বলে।

যে বাক্যে না বাচক শব্দ থাকে, তাকে নেতিবাচক বাক্য বা না বাচক বাক্য বলে।

যেমন- তুমি কালকে আসবে না।

আমি ঢাকা যাব না।

[নেতিবাচক বা নঞর্থক বাক্য : এ ধরনের বাক্যে কোন কিছু হয় না বা ঘটছে না- নিষেধ, আকাঙ্ক্ষা, অস্বীকৃতি ইত্যাদি সংবাদ কিংবা ভাব প্রকাশ করা যায়। যেমন :

আজ ট্রেন চলবে না।

আপনি আমার সঙ্গে কথা বলবেন না।

অস্তিবাচক- নেতিবাচক বাক্যের রূপান্তর

[বাক্য রূপান্তর : বাক্যের অর্থ পরিবর্তন না করে বাক্যের প্রকাশভঙ্গি বা গঠনরীতিতে পরিবর্তন করাকেই বাক্য রূপান্তর বলা হয়। অর্থাৎ, বাক্য রূপান্তর করার সময় খেয়াল রাখতে হবে, বাক্যের অর্থ যেন পাল্টে না যায়। বাক্যের অর্থ পাল্টে গেলে বাক্যটি অন্য বাক্যে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। কিন্তু বাক্য রূপান্তরের ক্ষেত্রে আমাদেরকে বাক্যের প্রকাশভঙ্গি বা গঠনরীতি তথা রূপ (Form) পরিবর্তন করতে হবে, বাক্যের অর্থ পরিবর্তন করা যাবে না।]

অস্তিবাচক বাক্যকে নেতিবাচক বাক্যে রূপান্তরের কৌশল

ক) বিশেষণ পদের বিপরীত শব্দ ব্যবহার করে অনেক অস্তিবাচক বাক্যকে নেতিবাচক বাক্যে রূপান্তর করা যায়। যেমন-

অস্তিবাচক বাক্য : তুমি খুব ভাল।

নেতিবাচক বাক্য : তুমি মোটেও খারাপ নও। (ভাল- খারাপ)

খ) ‘না করলেই নয়’, ‘না করে পারবো না’ ইত্যাদি বাক্যাংশ যোগ করে অনেক অস্তিবাচক বাক্যকে নেতিবাচক বাক্যে রূপান্তর করতে হয়। যেমন-

অস্তিবাচক বাক্য : তুমি কালকে আসবে।

নেতিবাচক বাক্য : তুমি কালকে না আসলেই নয়।

অস্তিবাচক বাক্য : ইডিপিডিবিডি ওয়েবসাইটটি এতো ভাল, তুমি আবার ঢুকবেই।

নেতিবাচক বাক্য : ইডিপিডিবিডি ওয়েবসাইটটি এতো ভাল, তুমি আবার না ঢুকে পারবেই না।

গ) নতুন কোন বিপরীতার্থক বা নঞর্থক (না বোধক) শব্দ যোগ করে। যেমন-

অস্তিবাচক বাক্য : সে বইয়ের পাতা উল্টাতে থাকল।





নেতিবাচক বাক্য : সে বইয়ের পাতা উল্টানো বন্ধ রাখলো না।

### নেতিবাচক বাক্যকে অস্তিবাচক বাক্যে রূপান্তরের কৌশল

ক) বিশেষণ পদের বিপরীত শব্দ ব্যবহার করে অনেক নেতিবাচক বাক্যকে অস্তিবাচক বাক্যে রূপান্তর করা যায়। যেমন-

নেতিবাচক বাক্য : সে ক্লাশে উপস্থিত ছিল না।

অস্তিবাচক বাক্য : সে ক্লাশে অনুপস্থিত ছিল।

খ) নেতিবাচক বাক্যের না বোধক বাক্যাংশকে কোন বিপরীতার্থক বিশেষণে রূপান্তর করেও অস্তিবাচক বাক্যে রূপান্তর করা যায়। যেমন-

নেতিবাচক বাক্য : দেবার্চনার কথা তিনি কোনদিন চিন্তাও করেন নি।

অস্তিবাচক বাক্য : দেবার্চনার কথা তার কাছে অচিন্ত্যনীয় ছিল।

নেতিবাচক বাক্য : এসব কথা সে মুখেও আনতে পারত না।

অস্তিবাচক বাক্য : এসব কথা তার কাছে অকথ্য ছিল।

গ) নতুন কোন অস্তিবাচক বিপরীতার্থক শব্দ যোগ করে। যেমন-

নেতিবাচক বাক্য : মা জেগে দেখে খোকা তার পাশে নেই।

অস্তিবাচক বাক্য : মা জেগে দেখে খোকা তার পাশে অনুপস্থিত।

প্রশ্ন : ইডিপিডিবিডি ওয়েবসাইটটি কি পড়াশোনা করার জন্য খারাপ ?

নেতি : ইডিপিডিবিডি ওয়েবসাইটটি পড়াশোনা করার জন্য খারাপ না।

প্রশ্ন : তুমি কি ছবিটা দেখোনি ?

নেতি : তুমি ছবিটা না দেখে পারোনি।

বিস্ময়সূচক বাক্য : যে বাক্যে আশ্চর্য হওয়ার অনুভূতি প্রকাশিত হয়, তাকে বিস্ময়সূচক বাক্য বলে। যেমন-  
সে কী ভীষণ ব্যাপার !

ইচ্ছাসূচক বাক্য : যে বাক্যে শুভেচ্ছা, প্রার্থনা, আশীর্বাদ, আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করা হয়, তাকে ইচ্ছাসূচক বাক্য বলে। যেমন-  
তোমার মঙ্গল হোক। ঈশ্বর সকলের মঙ্গল করচেন। ভালো থেকো।

আদেশ বাচক বাক্য : যে বাক্যে আদেশ করা হয়, তাকে আদেশ সূচক বাক্য বলে। যেমন-

বের হয়ে যাও। ওখানে বসো। জানালা লাগাও। সবসময় দেশের কথা মাথায় রেখে কাজ করবে।

### গঠন অনুযায়ী বাক্যের শ্রেণীবিভাগ

গঠন অনুযায়ী বাক্য ৩ প্রকার- সরল বাক্য, জটিল বা মিশ্র বাক্য ও যৌগিক বাক্য।

সরল বাক্য : যে বাক্যে একটি কর্তা বা উদ্দেশ্য ও একটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকে, তাকে সরল বাক্য বলে। যেমন-

পুকুরে পদ্ম ফোটে। (উদ্দেশ্য- পুকুরে, সমাপিকা ক্রিয়া- ফোটে)

মা শিশুকে ভালোবাসে। (উদ্দেশ্য- মা, সমাপিকা ক্রিয়া- ভালোবাসে)

ছেলেরা মাঠে খেলতে খেলতে হঠাৎ করে সবাই মিলে গাইতে শুরু করলে বড়রা ওদেরকে আচ্ছামত বকে দিল। (উদ্দেশ্য- বড়রা, সমাপিকা ক্রিয়া- (বকে) দিল) (অন্য ক্রিয়াগুলোর সবগুলোই অসমাপিকা ক্রিয়া। তাই সেগুলো বাক্যের গঠনে কোনো প্রভাব ফেলে না।)



/ExamKaDarrNahi



/info\_EKDN



8276808358

সরল বাক্য চেনার সহজ উপায় হলো, সরল বাক্যে একটিই সমাপিকা ক্রিয়া থাকে। কারণ, সরল বাক্যের ভেতরে কোন খণ্ডবাক্য বা একাধিক পূর্ণবাক্য থাকে না।

**জটিল বা মিশ্র বাক্য :** যে বাক্যে একটি প্রধান খণ্ডবাক্য ও তাকে আশ্রয় বা অবলম্বন করে একাধিক খণ্ডবাক্য থাকে, তাকে জটিল বা মিশ্র বাক্য বলে।

জটিল বাক্যে একাধিক খণ্ডবাক্য থাকে। এদের মধ্যে একটি প্রধান থাকে, এবং অন্যগুলো সেই বাক্যের উপর নির্ভর করে। প্রতিটি খণ্ডবাক্যের পরে কমা (,) বসে। যেমন-

যে পরিশ্রম করে,/ সে-ই সুখ লাভ করে। (প্রথম অংশটি আশ্রিত খণ্ডবাক্য, দ্বিতীয়টি প্রধান খণ্ডবাক্য)

যত পড়বে,/ তত শিখবে,/ তত ভুলবে। (প্রথম দুটি অংশ আশ্রিত খণ্ডবাক্য, শেষ অংশটি প্রধান খণ্ডবাক্য)

জটিল বা মিশ্র বাক্য চেনার সহজ উপায় হল, এ ধরনের বাক্যে সাধারণত যে- সে, যত- তত, যারা- তারা, যাদের- তাদের, যখন- তখন - এ ধরনের সাপেক্ষ সর্বনাম পদ থাকে। দুইটি অব্যয় যদি অর্থ প্রকাশের জন্য পরস্পরের উপর নির্ভর করে, তবে তাকে সাপেক্ষ সর্বনাম বলে। আবার যদি- তবু, অথচ- তথাপি- এ রকম কিছু পরস্পর সাপেক্ষ সর্বনাম/অব্যয়ও জটিল/মিশ্র বাক্যে ব্যবহৃত হয়। তবে এ ধরনের অব্যয় ছাড়াও জটিল বা মিশ্র বাক্য হতে পারে।

**যৌগিক বাক্য :** একাধিক সরল বাক্য কোন অব্যয় দ্বারা সংযুক্ত হয়ে একটি বাক্য গঠন করলে তাকে যৌগিক বাক্য বলে। যেমন-

তার বয়স হয়েছে, কিন্তু বুদ্ধি হয়নি। (সরল বাক্য দুটি- তার বয়স হয়েছে, তার বুদ্ধি হয়নি)

সে খুব শক্তিশালী এবং বুদ্ধিমান। (সরল বাক্য দুটি- সে খুব শক্তিশালী, সে খুব বুদ্ধিমান)

যৌগিক বাক্যে এবং, ও, আর, কিন্তু, অথবা, অথচ, কিংবা, বরং, তথাপি- এই অব্যয়গুলো দিয়ে দুটি সরল বাক্য যুক্ত হয়। এগুলো দেখে সহজেই যৌগিক বাক্যকে চেনা যেতে পারে। তবে কোন অব্যয় ছাড়াও দুটি সরল বাক্য একসঙ্গে হয়ে যৌগিক বাক্য গঠন করতে পারে।

[একাধিক বাক্য বা খণ্ড বাক্য নিয়ে কোনো বাক্য তৈরি হলে এবং খণ্ড বাক্যগুলোর মধ্যে পরস্পর নির্ভরতা থাকলে ঐ ধরনের বাক্যকে জটিল বাক্য বলে।]

সরল-জটিল-যৌগিক বাক্যের রূপান্তর

[**বাক্য রূপান্তর :** বাক্যের অর্থ পরিবর্তন না করে বাক্যের প্রকাশভঙ্গি বা গঠনরীতিতে পরিবর্তন করাকেই বাক্য রূপান্তর বলা হয়। অর্থাৎ, বাক্য রূপান্তর করার সময় খেয়াল রাখতে হবে, বাক্যের অর্থ যেন পাল্টে না যায়। বাক্যের অর্থ পাল্টে গেলে বাক্যটি অন্য বাক্যে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। কিন্তু বাক্য রূপান্তরের ক্ষেত্রে আমাদেরকে বাক্যের প্রকাশভঙ্গি বা গঠনরীতি তথা রূপ (Form) পরিবর্তন করতে হবে, বাক্যের অর্থ পরিবর্তন করা যাবে না।]

**সরল থেকে জটিল বাক্যে রূপান্তর :** সরল বাক্যের কোন একটি অংশকে সম্প্রসারিত করে একটি খন্ডবাক্যে রূপান্তরিত করতে হয় এবং তার খণ্ডবাক্যটির সঙ্গে মূল বাক্যের সংযোগ করতে উপরোক্ত সাপেক্ষ সর্বনাম বা সাপেক্ষ অব্যয়গুলোর কোনটি ব্যবহার করতে হয়। যেমন-

সরল বাক্য : ভাল ছেলেরা কম্পিউটারে বসেও ইন্টারনেটে পড়াশুনা করে।

জটিল বাক্য : যারা ভাল ছেলে, তারা কম্পিউটারে বসেও ইন্টারনেটে পড়াশুনা করে।



জটিল থেকে সরল বাক্যে রূপান্তর : জটিল বাক্যটির অপ্রধান/ আশ্রিত খণ্ডবাক্যটিকে একটি শব্দ বা শব্দাংশে পরিণত করে সরল বাক্যে রূপান্তর করতে হয়। যেমন-

জটিল বাক্য : যদি দোষ স্বীকার কর তাহলে তোমাকে কোন শাস্তি দেব না।

সরল বাক্য : দোষ স্বীকার করলে তোমাকে কোন শাস্তি দেব না।

**সরল থেকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর :** সরল বাক্যের কোন অংশকে সম্প্রসারিত করে একটি পূর্ণ বাক্যে রূপান্তরিত করতে হয় এবং পূর্ণ বাক্যটির সঙ্গে মূল বাক্যের সংযোগ করতে উপরোক্ত অব্যয়গুলো ব্যবহার করতে হবে। যেমন-

সরল বাক্য : দোষ স্বীকার করলে তোমাকে কোন শাস্তি দেব না।

যৌগিক বাক্য : দোষ স্বীকার কর, তাহলে তোমাকে কোন শাস্তি দেব না। (এক্ষেত্রে ‘তাহলে’ অব্যয়টি ব্যবহার না করলেও চলতো)

সরল বাক্য : আমি বহু কষ্টে শিক্ষা লাভ করেছি।

যৌগিক বাক্য : আমি বহু কষ্ট করেছি এবং/ ফলে শিক্ষা লাভ করেছি।

**যৌগিক থেকে সরল বাক্যে রূপান্তর :** যৌগিক বাক্যে একাধিক সমাপিকা ক্রিয়া থাকে। অন্যদিকে সরল বাক্যে একটিই সমাপিকা ক্রিয়া থাকে। তাই যৌগিক বাক্যের একটি সমাপিকা ক্রিয়াকে অপরিবর্তিত রেখে বাকিগুলোকে সমাপিকা ক্রিয়ায় পরিণত করতে হবে। যৌগিক বাক্যে একাধিক পূর্ণ বাক্য থাকে এবং তাদের সংযোগ করার জন্য একটি অব্যয় পদ থাকে। সেই অব্যয়টি বাদ দিতে হবে। যেমন-

যৌগিক বাক্য : মেঘ গর্জন করে, তবে ময়ূর নৃত্য করে। (সমাপিকা ক্রিয়া- করে ও করে)

সরল বাক্য : মেঘ গর্জন করলে ময়ূর নৃত্য করে। (‘করে’ সমাপিকা ক্রিয়াকে ‘করলে’ অসমাপিকা ক্রিয়ায় রূপান্তরিত করা হয়েছে)

[সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া; ক্রিয়াপদ]

**জটিল থেকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর :** জটিল বাক্যে কয়েকটি খণ্ডবাক্য থাকে, এবং সেগুলো পরস্পর নির্ভরশীল থাকে। জটিল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর করতে হলে এই খণ্ডবাক্যগুলোর পরস্পর নির্ভরতা মুছে দিয়ে স্বাধীন করে দিতে হবে। এজন্য সাপেক্ষ সর্বনাম বা অব্যয়গুলো তুলে দিয়ে যৌগিক বাক্যে ব্যবহৃত অব্যয়গুলোর মধ্যে উপযুক্ত অব্যয়টি বসাতে হবে। পাশাপাশি ক্রিয়াপদের গঠনের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। যেমন-

জটিল বাক্য : যদি সে কাল আসে, তাহলে আমি যাব।

যৌগিক বাক্য : সে কাল আসবে এবং আমি যাব।

**যৌগিক থেকে জটিল বাক্যে রূপান্তর :** যৌগিক বাক্যে দুইটি পূর্ণ বাক্য কোন অব্যয়ের দ্বারা যুক্ত থাকে। এই অব্যয়টি তুলে দিয়ে সাপেক্ষ সর্বনাম বা অব্যয়ের প্রথমটি প্রথম বাক্যের পূর্বে ও দ্বিতীয়টি দ্বিতীয় বাক্যের পূর্বে বসালেই জটিল বাক্যে রূপান্তরিত হবে।

তবে, সাপেক্ষ সর্বনাম বা অব্যয়গুলোর পূর্ণ বাক্য দুটির প্রথমের বসাতে হবে, এমন কথা নেই; উপযুক্ত যে কোন জায়গাতেই বসানো যেতে পারে। যেমন-

যৌগিক বাক্য : দোষ স্বীকার কর, তোমাকে কোন শাস্তি দেব না।

জটিল বাক্য : যদি দোষ স্বীকার কর, তাহলে তোমাকে কোন শাস্তি দেব না।

যৌগিক বাক্য : তিনি অত্যন্ত দরিদ্র, কিন্তু তার হৃদয় অত্যন্ত মহৎ।

জটিল বাক্য : যদিও তিনি অত্যন্ত দরিদ্র, তবুও তার হৃদয় অত্যন্ত মহৎ।





## জটিল থেকে সরল বাক্যে রূপান্তর

জটিল : কেহ কহিয়া দিতেছে না, তথাপি তপোবন বলিয়া বোধ হইতেছে।

সরল : কেহ কহিয়া না দিলেও তপোবন বলিয়া বোধ হইতেছে।

জটিল : শরাসনে যে শর সংহিত করিয়াছেন, আশু তাহার প্রতिसংহার করুন।

সরল : শরাসনে সংহিত শর আশু প্রতिसংহার করুন।

জটিল : যদি কার্যক্ষতি না হয়, তথায় গিয়া অতিথি সৎকার করুন।

সরল : কার্যক্ষতি না হইলে তথায় গিয়া অতিথি সৎকার করুন।

জটিল : ইহারা যেরূপ, এরূপ রূপবতী রমণী আমার অন্তঃপুরে নাই।

সরল : ইহাদের মতো রূপবতী রমণী আমার অন্তঃপুরে নাই।

জটিল : তুমি নবমালিকা কুসুমকোমলা, তথাপি তোমায় আলবালজলসেচনে নিযুক্ত করিয়াছেন।

সরল : তুমি নবমালিকা কুসুমকোমলা হওয়া সত্ত্বেও তোমায় আলবালজলসেচনে নিযুক্ত করিয়াছেন।

## সরল থেকে জটিল বাক্যে রূপান্তর

সরল : ফরিয়াদী প্রসন্ন গোয়ালিনী।

জটিল : যে ফরিয়াদী, সে প্রসন্ন গোয়ালিনী।

সরল : সাক্ষীটী কী একটা গণ্ডগোল বাধাইতেছে।

জটিল : যে সাক্ষী, সে একটা গণ্ডগোল বাধাইতেছে।

সরল : আমার নিবাস নাই।

জটিল : যা নিবাস, তা আমার নাই।

সরল : তোমার বাপের নাম কী ?

জটিল : তোমার যিনি বাপ, তার নাম কী ?

সরল : আমি এ সাক্ষী চাই না।

জটিল : যে সাক্ষী এ রকম, তাকে আমি চাই না।

সরল : কমলাকান্ত পিতার নাম বলল।

জটিল : যিনি কমলাকান্তের পিতা, সে তাঁর নাম বলল।

সরল : কোনো কথা গোপন করিব না।

জটিল : যাহা বলিব, তাহার মধ্যে কোনো কথা গোপন করিব না।

সরল : উকিলবাবু চুপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন।

জটিল : যিনি উকিলবাবু, তিনি চুপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন।



## যৌগিক থেকে সরল বাক্যে রূপান্তর

যৌগিক : কন্যার বাপ সবুর করিতে পারিতেন, কিন্তু বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না।

সরল : কন্যার বাপ সবুর করিতে পারিলেও বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না।

যৌগিক : আমি ছিলাম বর, সুতরাং বিবাহ সম্বন্ধে আমার মত যাচাই করা অনাবশ্যক ছিল।

সরল : আমি বর ছিলাম বলে বিবাহ সম্বন্ধে আমার মত যাচাই করা অনাবশ্যক ছিল।

যৌগিক : শিশিরের বয়স যথাসময়ে ষোলো হইল; কিন্তু সেটা স্বভাবের ষোলো।

সরল : শিশিরের বয়স যথাসময়ে ষোলো হইলেও সেটা ছিল স্বভাবের ষোলো।

যৌগিক : তোমাকে এই কটি দিন মাত্র জানিলাম, তবু তোমার হাতেই ও রহিল।

সরল : তোমাকে এই কটি দিন মাত্র জানিলেও তোমার হাতেই ও রহিল।

বাক্য প্রকরণ

**বাক্য :** কতোগুলো পদ সুবিন্যস্ত হয়ে বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করলে তাকে বাক্য বলে।

বাক্যে কতোগুলো পদ থাকে। শব্দের সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হলে তাকে পদ বলে। এই বিভক্তি যুক্ত হয়ে শব্দগুলো পরস্পর সম্পর্কিত হয়ে বাক্য গঠন করে। নয়তো বাক্য তৈরি হয় না। যেমন- আমা মা আমা অনেক আদর করে। এখানে মূল শব্দগুলো বিভক্তি ছাড়া সঠিক ক্রমে (ডংফবৎ) সাজানো হলেও একটির সঙ্গে আরেকটি শব্দের কোন সম্পর্ক তৈরি হয়নি। শব্দগুলোতে বিভক্তি যুক্ত করলে একটি সম্পূর্ণ বাক্য তৈরি হবে- আমার মা আমাকে অনেক আদর করে।

**ভাষার মূল উপকরণ বাক্য, বাক্যের মৌলিক উপাদান শব্দ। আর ভাষার মূল উপাদান ধ্বনি।**

ভাষার বিচারে/ব্যাকরণ অনুযায়ী একটি সার্থক বাক্যের ৩টি গুণ থাকতেই হবে/আবশ্যক- আকাঙক্ষা, আসত্তি, যোগ্যতা।

**আকাঙক্ষা :** বাক্যে সম্পূর্ণ একটি মনোভাব থাকতে হবে। বাক্যের ভাব বা বক্তার বক্তব্য অসম্পূর্ণ থাকলে সেটি বাক্য হবে না। যেমন- মা আমাকে অনেক...

বা মা আমাকে অনেক আদর...

উপরের কোন বাক্যই বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ করছে না। দুটি বাক্য শেষ হওয়ার পরও আরো কিছু শোনার আকাঙক্ষা থেকে যাচ্ছে। সুতরাং, কোন বাক্যেরই আকাঙক্ষা গুণটি নেই। তাই কোনটিই বাক্য নয়। সম্পূর্ণ বাক্যটি হবে- মা আমাকে অনেক আদর করে।

এটি শোনার পর আর কিছু শোনার আগ্রহ বাকি থাকছে না। সুতরাং এটি আকাঙক্ষা গুণ সম্পন্ন একটি সার্থক বাক্য।

অর্থাৎ, শ্রোতার সম্পূর্ণ বাক্য শোনার আগ্রহ-ই আকাঙক্ষা।

**আসত্তি :** বাক্যের পদগুলোকে সঠিক ক্রমে/ অর্ডারে না সাজালে সেটি বাক্য হয় না। উপরের বাক্যের পদগুলো অন্যভাবে সাজালে সেটি বাক্য নাও হতে পারে। যেমন, উপরের বাক্যকে যদি এভাবে সাজানো হয়-

আমার অনেক মা আদর আমাকে করে।



এখানে বাক্যের প্রকৃত অর্থ যেমন বিকৃত হয়ে গেছে, তেমনি বিকৃত অর্থও পরিষ্কার ভাবে প্রকাশিত হয়নি। সুতরাং, বাক্যের পদগুলোকেও সঠিক ক্রমানুযায়ী বিন্যস্ত করতে হবে। বাক্যের এই বিন্যাসকেই আসত্তি বলে। উপরের বাক্যটিকে সঠিক ক্রমে সাজালে হবে-

আমার মা আমাকে অনেক আদর করে।

এখানে বাক্যের পদগুলোর বিন্যাস বাক্যটির অর্থ সঠিক ও পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করছে। সুতরাং এটি আসত্তি গুণ সম্পন্ন একটি সার্থক বাক্য।

অর্থাৎ, বাক্যের পদগুলোকে সঠিক ক্রমে (Order) বিন্যস্ত করে বক্তার মনোভাব সঠিক ও পরিষ্কার করে বোঝানোর কৌশলই আসত্তি গুণ।

**যোগ্যতা :** বাক্যের অর্থ সঠিক ও পরিষ্কার করে বোঝাতে আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তি গুণ ছাড়াও আরো একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হয়। বাক্যের পদগুলো যদি পরস্পর অর্থগত ও ভাবগত দিক দিয়ে সম্পর্কিত না হয়, তাহলেও সেটি সার্থক বাক্য হয় না। যেমন-

গ্রীষ্মের বৃষ্টিতে পলাবনের সৃষ্টি হয়েছে।

বাক্যটিতে আকাঙ্ক্ষা গুণও যেমন আছে, তেমনি এতে আসত্তি গুণও আছে। কিন্তু বাক্যটি সার্থক বাক্য নয়। কারণ, গ্রীষ্মে বৃষ্টিই হয় না। সুতরাং, সেই বৃষ্টিতে পলাবনের প্রশ্নই আসে না। সুতরাং, বাক্যের পদগুলোর মধ্যে অর্থগত এবং ভাবগত কোনই মিল নেই। বাক্যটি যদি এভাবে লেখা হয়-

বর্ষার বৃষ্টিতে পলাবনের সৃষ্টি হয়েছে।

তাহলে বাক্যটির পদগুলোর মধ্যে অর্থগত ও ভাবগত মিল পাওয়া যাচ্ছে। ফলে এটি একটি যোগ্যতা গুণ সম্পন্ন সার্থক বাক্য।

অর্থাৎ, বাক্যের শব্দগুলোর অর্থগত ও ভাবগত মিলকেই যোগ্যতা বলে।

বাক্যের যোগ্যতার ক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলো জড়িত-

**ক) গুরুচণ্ডালী দোষ :** সংশ্লিষ্ট দুটি শব্দের একটি তৎসম ও একটি তদ্ভব শব্দ ব্যবহার করলে সেটি বাক্যের যোগ্যতা গুণ নষ্ট করে। কারণ, তাতে পদগুলোর ভাবগত মিল নষ্ট হয়। একে গুরুচণ্ডালী দোষ বলে।

যেমন- ‘গরুর গাড়ি’ শব্দদুটো সংশ্লিষ্ট শব্দ এবং দুটিই খাঁটি বাংলা শব্দ। আমরা যদি একে ‘গরুর শকট’ বলি, তা শুনতে যেমন বিশ্রী শোনায়, তেমনি শব্দদুটোর ভাবগত মিলও আর থাকে না। এটিই গুরুচণ্ডালী দোষ। এরকম- ‘শবদাহ’কে ‘মড়াদাহ’ কিংবা ‘শবপোড়া’, ‘মড়াপোড়া’কে ‘শবপোড়া’ বা ‘মড়াদাহ’, বললে তা গুরুচণ্ডালী দোষ হবে।

অর্থাৎ, বাক্যে তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ ও তদ্ভব বা খাঁটি বাংলা শব্দ একসঙ্গে ব্যবহার করলে তাকে গুরুচণ্ডালী দোষ বলে।

**খ) বাহুল্য দোষ :** প্রয়োজনের অতিরিক্ত শব্দ বা শব্দাংশ ব্যবহার করলে শব্দের অর্থগত যোগ্যতা নষ্ট হয়। ফলে বাক্যও যোগ্যতা গুণ হারায়।

শব্দকে বহুবচন করার সময় একাধিক বহুবচনবোধক শব্দ বা শব্দাংশ ব্যবহার করা একটি সাধারণ বাহুল্য দোষ। অধিক জোর দেয়ার জন্য অনেক সময় এই কৌশল প্রয়োগ করা হলেও সাধারণ ক্ষেত্রে একাধিক বহুবচনবোধক শব্দ বা শব্দাংশ ব্যবহার করলে শব্দটি বাহুল্য দোষে দুষ্ট হয়। যেমন- ‘সব মানুষেরা’ বাহুল্য দোষে দুষ্ট শব্দ। যোগ্যতা গুণ সম্পন্ন বাক্যে ‘সব মানুষ’ বা ‘মানুষেরা’- এই দুটির যে কোন একটি ব্যবহার করতে হবে।

**গ) উপমার ভুল প্রয়োগ :** উপমা-অলংকার সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে। এগুলোর প্রয়োগে কোন ভুল হলে বাক্য তার ভাবগত যোগ্যতা হারাবে। যেমন-

আমার হৃদয়-মন্দিরে আশার বীজ উগ্ধ হল।



বাক্যটিতে উপমার ভুল প্রয়োগ হয়েছে। কারণ, বীজ মন্দিরে উগ্ৰ হয় না/ বপন করা হয় না। বীজ বপন করা হয় ক্ষেতে। সুতরাং বলতে হবে-

আমার হৃদয়-ক্ষেত্রে আশার বীজ উগ্ৰ হল।

**ঘ) বাগধারার শব্দ পরিবর্তন :** বাগধারা ভাষার একটি ঐতিহ্য। বাংলা ভাষাতেও অসংখ্য বাগধারা প্রচলিত আছে। এসব বাগধারা ব্যবহার করার সময় এগুলোর কোন পরিবর্তন করলে বাগধারার ভাবগত যোগ্যতা নষ্ট হয়। ফলে বাক্য তার যোগ্যতা গুণ হারায়। সুতরাং, যোগ্যতা সম্পন্ন সার্থক বাক্য তৈরি করতে বাগধারা সঠিকভাবেই লিখতে হবে।

যেমন- যদি বলা হয়, ‘অরণ্যে ক্রন্দন’, তাহলে গুরুচণ্ডালী দোষও হয় না। কিন্তু বাগধারাটির শব্দ পরিবর্তন করার কারণে এটি তার ভাবগত যোগ্যতা হারিয়েছে। যোগ্যতা সম্পন্ন বাক্য গঠন করতে হলে প্রচলিত বাগধারাটিই লিখতে হবে। অর্থাৎ, ‘অরণ্যে রোদন’ই লিখতে হবে।

**ঙ) দুর্বোধ্যতা :** অপ্রচলিত কিংবা দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করলে বাক্য তার যোগ্যতা গুণ হারায়। এই ধরনের শব্দ বাক্যের শব্দগুলোর মধ্যে অর্থগত মিলবন্ধন নষ্ট করে। যেমন-

এ কী প্রপঞ্চ!

বাক্যটির প্রপঞ্চ শব্দটি অপ্রচলিত, একই সঙ্গে দুর্বোধ্য। তাই বাক্যটির অর্থ পরিস্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে না। ফলে বাক্যের পদগুলোর মধ্যের অর্থগত মিলবন্ধন বিনষ্ট হয়েছে। তাই এটি কোন যোগ্যতা সম্পন্ন সার্থক বাক্য হতে পারেনি।

**চ) রীতিসিদ্ধ অর্থবাচকতা :** বাক্যে শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে, শব্দগুলো যাতে তাদের রীতিসিদ্ধ অর্থ অনুযায়ী ব্যবহৃত হয়। শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও ব্যবহারিক বা রীতিসিদ্ধ অর্থ ভিন্ন হলে, অবশ্যই রীতিসিদ্ধ অর্থে শব্দ ব্যবহার করতে হবে। নয়তো শব্দটির সঙ্গে বাক্যের অন্য শব্দগুলোর অর্থগত মিলবন্ধন নষ্ট হবে। যেমন-

‘বাধিত’ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ‘বাধাপ্রাপ্ত’। আর ব্যবহারিক বা রীতিসিদ্ধ অর্থ হলো ‘কৃতজ্ঞ’। শব্দটি ব্যবহারের সময় কৃতজ্ঞ অর্থেই ব্যবহার করতে হবে। নয়তো তা অর্থ বিকৃত করবে। ফলে বাক্যটি যোগ্যতা গুণ হারাবে।

উদ্দেশ্য ও বিধেয়

প্রতিটি বাক্যের দুটি অংশ থাকে- উদ্দেশ্য ও বিধেয়।

বাক্যে যার সম্পর্কে কিছু বলা হয়, তাকে উদ্দেশ্য বলে।

বাক্যে উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়, তাই বিধেয়।

যেমন- বইটি খুব ভালো।

বাক্যটিতে বইটি’ সম্পর্কে বলা হয়েছে। সুতরাং, এখানে ‘বইটি’ উদ্দেশ্য। অন্যদিকে, ‘বইটি’ সম্পর্কে বলা হয়েছে ‘খুব ভালো’। এই ‘খুব ভালো’ বাক্যটির বিধেয় অংশ।

উদ্দেশ্য অংশ একটি শব্দ না হয়ে একটি বাক্যাংশও হতে পারে। এবং সেই শব্দ বা বাক্যাংশটি শুধু বিশেষ্য-ই হবে, এমন কোন কথাও নেই। উদ্দেশ্য বিশেষণ বা বিশেষণভাবাপন্ন বাক্যাংশ, এমনকি ক্রিয়াভাবাপন্ন বাক্যাংশও হতে পারে।

উদ্দেশ্য                      বিধেয়

সং হওয়া                      খুব কঠিন। (এখানে ক্রিয়াভাবাপন্ন বাক্যাংশ উদ্দেশ্য)

সং লোকেরাই                      প্রকৃত সুখী। (এখানে বিশেষণভাবাপন্ন বাক্যাংশ উদ্দেশ্য)

## বাক্য সংকোচন/ এক কথায় প্রকাশ



/ExamKaDarrNahi



/info\_EKDN



8276808358

একাধিক পদ বা উপবাক্যকে একটি শব্দে প্রকাশ করা হলে, তাকে বাক্য সংকোচন, বাক্য সংক্ষেপণ বা এক কথায় প্রকাশ বলে।  
 অর্থাৎ একটিমাত্র শব্দ দিয়ে যখন একাধিক পদ বা একটি বাক্যাংশের (উপবাক্য) অর্থ প্রকাশ করা হয়, তখন তাকে বাক্য সংকোচন বলে।  
 যেমন- হীরক দেশের রাজা- হীরকরাজ  
 এখানে হীরকরাজ- শব্দের মাধ্যমে হীরক দেশের রাজা- এই তিনটি পদের অর্থই সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এই তিনটি পদ একত্রে একটি বাক্যাংশ বা উপবাক্যও বটে। অর্থাৎ, হীরক দেশের রাজা- তিনটি পদ বা বাক্যাংশটির বাক্য সংকোচন হল- হীরকরাজ।

### কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাক্য সংকোচন/এক কথায় প্রকাশ

অকালে পেকেছে যে- অকালপক্ব  
 অক্ষির সম্মুখে বর্তমান- প্রত্যক্ষ  
 অভিজ্ঞতার অভাব আছে যার- অনভিজ্ঞ  
 অহংকার নেই যার- নিরহংকার  
 অশ্বের ডাক- হ্রেষা  
 অতি কর্মনিপুণ ব্যক্তি- দক্ষ  
 অনুসন্ধান করবার ইচ্ছা- অনুসন্ধিৎসা  
 অনুসন্ধান করতে ইচ্ছুক যে- অনুসন্ধিৎসু  
 অপকার করবার ইচ্ছা- অপচিকীর্ষা  
 অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে কাজ করে যে- অবিমূষ্যকারী  
 অতি শীতও নয়, অতি উষ্ণও নয়- নাতিশীতোষ্ণ  
 অবশ্য হবে/ঘটবে যা- অবশ্যসম্ভাবী  
 অতি দীর্ঘ নয় যা- নাতিদীর্ঘ  
 অতিক্রম করা যায় না যা- অনতিক্রমণীয়/অনতিক্রম্য  
 যা সহজে অতিক্রম করা যায় না- দুরতিক্রমণীয়/দুরতিক্রম্য  
 অগ্রে জন্মেছে যে- অগ্রজ  
 অনুতে/পশ্চাতে/পরে জন্মেছে যে- অনুজ  
 অরিকে দমন করে যে- অরিন্দম  
 অন্য উপায় নেই যার- অনন্যোপায়  
 অনেকের মাঝে একজন- অন্যতম  
 অন্য গাছের ওপর জন্মে যে গাছ- পরগাছা  
 আচারে নিষ্ঠা আছে যার- আচারনিষ্ঠ  
 আপনাকে কেন্দ্র করে চিন্তা যার- আত্মকেন্দ্রীক  
 আকাশে চরে যে- খেচর  
 আকাশে গমন করে যে- বিহগ, বিহঙ্গ  
 আট প্রহর যা পরা যায়- আটপৌরে  
 আপনার রং লুকায়ে যে/যার প্রকৃত বর্ণ ধরা যায় না- বর্ণচোরা  
 আয় অনুসারে ব্যয় করে যে- মিতব্যয়ী  
 আপনাকে পণ্ডিত মনে করে যে- পণ্ডিতম্ভন্য  
 আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত- আদ্যন্ত  
 ইতিহাস রচনা করেন যিনি- ঐতিহাসিক  
 ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ যিনি- ইতিহাসবেত্তা  
 ইন্দ্রকে জয় করেছে যে- ইন্দ্রজিৎ  
 ইন্দ্রিয়কে জয় করেছে যে- জিতেন্দ্রিয়  
 ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস আছে যার- আস্তিক

ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস নেই যার- নাস্তিক  
 ঈষৎ আমিষ/আঁষ গন্ধ যার- আঁষটে  
 উপকার করবার ইচ্ছা- উপচিকীর্ষা  
 উপকারীর উপকার স্বীকার করে যে- কৃতজ্ঞ  
 উপকারীর উপকার স্বীকার করে না যে- অকৃতজ্ঞ  
 উপকারীর অপকার করে যে- কৃতঘ্ন  
 একই সময়ে বর্তমান- সমসাময়িক  
 একই মায়ের সন্তান- সহোদর  
 এক থেকে আরম্ভ করে- একাদিক্রমে  
 একই গুরুর শিষ্য- সতীর্থ  
 কথায় বর্ণনা যায় না যা- অনিবর্চনীয়  
 কোনভাবেই নিবারণ করা যায় না যা- অনিবার্য  
 সহজে নিবারণ করা যায় না যা/কষ্টে নিবারণ করা যায় না- দুর্নিবার  
 সহজে লাভ করা যায় না যা/কষ্টে লাভ করা যায় না- দুর্লভ  
 কোন কিছুতেই ভয় নেই যার- নিভীক, অকুতোভয়  
 ক্ষমার যোগ্য- ক্ষমার্হ  
 কউ জানতে না পারে এমনভাবে- অজ্ঞাতসারে  
 গোপন করার ইচ্ছা- জুগুপ্সা  
 চক্ষুর সম্মুখে সংঘটিত- চাক্ষুষ  
 চৈত্র মাসের ফসল- চৈতালি  
 জীবিত থেকেও যে মৃত- জীবন্মৃত  
 জানার ইচ্ছা- জিজ্ঞাসা  
 জানতে ইচ্ছুক- জিজ্ঞাসু  
 জ্বল জ্বল করছে যা- জাজ্বল্যমান  
 জয় করার ইচ্ছা- জিগীষা  
 জয় করতে ইচ্ছুক- জিগীষু  
 জানু পর্যন্ত লম্বিত- আজানুলম্বিত  
 তল স্পর্শ করা যায় না যার- অতলস্পর্শী  
 তীর ছোঁড়ে যে- তীরন্দাজ  
 দিনে যে একবার আহা কর- একাহারী  
 দীপ্তি পাচ্ছে যা- দীপ্যমান  
 দু'বার জন্মে যে- দ্বিজ  
 নষ্ট হওয়াই স্বভাব যার- নশ্বর  
 নদী মেখলা যে দেশের- নদীমেখলা  
 নৌকা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে যে- নাবিক





নিজেকে যে বড়ো মনে করে- হামবড়া  
 নূপুরের ধ্বনি- নিক্কণ  
 পা থেকে মাথা পর্যন্ত- আপাদমস্তক  
 প্রিয় বাক্য বলে যে নারী- প্রিয়বদা  
 পূর্বজন্ম স্মরণ করে যে- জাতিস্মর  
 পান করার যোগ্য- পেয়  
 পান করার ইচ্ছা- পিপাসা  
 ফল পাকলে যে গাছ মরে যায়- ওষধি  
 বিদেশে থাকে যে- প্রবাসী  
 বিশ্বজনের হিতকর- বিশ্বজনীন  
 ব্যাকরণ জানেন যিনি- বৈয়াকরণ  
 বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে গবেষণায় রত যিনি- বৈজ্ঞানিক  
 বেদ-বেদান্ত জানেন যিনি- বৈদান্তিক  
 বয়সে সবচেয়ে বড়ো যে- জ্যেষ্ঠ  
 বয়সে সবচেয়ে ছোটো যে- কনিষ্ঠ  
 ভোজন করার ইচ্ছা- বুভুক্ষা  
 মৃতের মত অবস্থা যার- মুমূর্ষু  
 মুষ্টি দিয়ে যা পরিমাপ করা যায়- মুষ্টিমেয়  
 মৃত্তিকা দ্বারা নির্মিত- মৃন্ময়  
 মর্মকে পীড়া দেয় যা- মর্মভুদ  
 মাটি ভেদ করে ওঠে যা- উদ্ভিদ  
 মৃত গবাদি পশু ফেলা হয় যেখানে- ভাগাড়  
 মন হরণ করে যা- মনোহর  
 মন হরণ করে যে নারী- মনোহারিণী  
 যা দমন করা যায় না- অদম্য  
 যা দমন করা কষ্টকর- দুর্দমনীয়  
 যা নিবারণ করা কষ্টকর- দুর্নিবার  
 যা পূর্বে ছিল এখন নেই- ভূতপূর্ব  
 যা বালকের মধ্যেই সুলভ- বালকসুলভ  
 যা বিনা যত্নে লাভ করা গিয়েছে- অযত্নলব্ধ  
 যা ঘুমিয়ে আছে- সুপ্ত  
 যা বার বার দুলছে- দোদুল্যমান  
 যা দীপ্তি পাচ্ছে- দেদীপ্যমান  
 যা সাধারণের মধ্যে দেখা যায় না- অনন্যসাধারণ  
 যা পূর্বে দেখা যায় নি- অদৃষ্টপূর্ব  
 যা কষ্টে জয় করা যায়- দুর্জয়  
 যা কষ্টে লাভ করা যায়- দুর্লভ  
 যা অধ্যয়ন করা হয়েছে- অধীত  
 যা অনেক কষ্টে অধ্যয়ন করা যায়- দুরধ্যয়  
 যা জলে চরে- জলচর  
 যা স্থলে চরে- স্থলচর  
 যা জলে ও স্থলে চরে- উভচর

যা বলা হয় নি- অনুক্ত  
 যা কখনো নষ্ট হয় না- অবিনশ্বর  
 যা মর্ম স্পর্শ করে- মর্মস্পর্শী  
 যা বলার যোগ্য নয়- অকথ্য  
 যার বংশ পরিচয় এবং স্বভাব কেউই জানে না- অজ্ঞাতকুলশীল  
 যা চিন্তা করা যায় না- অচিন্তনীয়, অচিন্ত্য  
 যা কোথাও উঁচু কোথাও নিচু- বন্ধুর  
 যা সম্পন্ন করতে বহু ব্যয় হয়- ব্যয়বহুল  
 যা খুব শীতল বা উষ্ণ নয়- নাতিশীতোষ্ণ  
 যার বিশেষ খ্যাতি আছে- বিখ্যাত  
 যা আঘাত পায় নি- অনাহত  
 যা উদিত হচ্ছে- উদীয়মান  
 যা ক্রমশ বর্ধিত হচ্ছে- বর্ধিষ্ণু  
 যা পূর্বে শোনা যায় নি- অশ্রুতপূর্ব  
 যা সহজে ভাঙ্গে- ভঙ্গুর  
 যা সহজে জীর্ণ হয়- সুপাচ্য  
 যা খাওয়ার যোগ্য- খাদ্য  
 যা চিবিয়ে/চর্বণ করে খেতে হয়- চর্ব্য  
 যা চুষে খেতে হয়- চোষ্য  
 যা লেহন করে খেতে হয়/লেহন করার যোগ্য- লেহ্য  
 যা পান করতে হয়/পান করার যোগ্য- পেয়  
 যা পানের অযোগ্য- অপেয়  
 যা বপন করা হয়েছে- উপ্ত  
 যা বলা হয়েছে- উক্ত  
 যার অন্য উপায় নেই- অনন্যোপায়  
 যার কোন উপায় নেই- নিরূপায়  
 যার উপস্থিত বুদ্ধি আছে- প্রত্যুৎপন্নমতি  
 যার সর্বস্ব হারিয়ে গেছে- সর্বহার, হতসর্বস্ব  
 যার কোনো কিছু থেকেই ভয় নেই- অকুতোভয়  
 যার আকার কুৎসিত- কদাকার  
 যার কোন শত্রু নেই/জন্মে নি- অজাতশত্রু  
 যার দাড়ি/শ্মশ্রু জন্মে নি- অজাতশ্মশ্রু  
 যার কিছু নেই- অকিঞ্চন  
 যে কোন বিষয়ে স্পৃহা হারিয়েছে- বীতস্পৃহ  
 যে শুনেই মনে রাখতে পারে- শ্রুতিধর  
 যে বাস্তু থেকে উৎখাত হয়েছে- উদ্বাস্তু  
 যে নারী নিজে বর বরণ করে নেয়- স্বয়ংবরা  
 যে গাছে ফল ধরে, কিন্তু ফুল ধরে না- বনস্পতি  
 যে রোগ নির্ণয় করতে হাতড়ে মরে- হাতুড়ে  
 যে নারীর সন্তান বাঁচে না/যে নারী মৃত সন্তান প্রসব করে- মৃতবৎসা  
 যে গাছ অন্য কোন কাজে লাগে না- আগাছা  
 যে গাছ অন্য গাছকে আশ্রয় করে বাঁচে- পরগাছা



যে পুরুষ বিয়ে করেছে- কৃতদার  
 যে মেয়ের বিয়ে হয়নি- অনুঢ়া  
 যে ক্রমাগত রোদন করছে- রোরুদ্যমান (স্ত্রীলিঙ্গ- রোরুদ্যমানা)  
 যে ভবিষ্যতের চিন্তা করে না বা দেখে না- অপরিণামদর্শী  
 যে ভবিষ্যৎ না ভেবেই কাজ করে/অগ্র পশ্চাত বিবেচনা না করে  
 কাজ করে যে- অবিমূশ্যকারী  
 যে বিষয়ে কোন বিতর্ক/বিসংবাদ নেই- অবিসংবাদী  
 যে বন হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ- স্থাপদসংকুল  
 যিনি বক্তৃতা দানে পটু- বাগ্মী  
 যে সকল অত্যাচারই সয়ে যায়- সর্বংসহা  
 যে নারী বীর সন্তান প্রসব করে- বীরপ্রসূ  
 যে নারীর কোন সন্তান হয় না- বক্ষ্যা  
 যে নারী জীবনে একমাত্র সন্তান প্রসব করেছে- কাকবক্ষ্যা  
 যে নারীর স্বামী প্রবাসে আছে- প্রোষিতভর্তৃকা  
 যে স্বামীর স্ত্রী প্রবাসে আছে- প্রোষিতপত্নীক  
 যে পুরুষের চেহারা দেখতে সুন্দর- সুদর্শন (স্ত্রীলিঙ্গ- সুদর্শনা)  
 যে রব শুনে এসেছে- রবাহত

যে লাফিয়ে চলে- প্লবগ  
 যে নারী কখনো সূর্য দেখেনি- অসূর্যম্পশ্যা  
 যে নারীর স্বামী মারা গেছে- বিধবা  
 যে নারীর সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে- নবোঢ়া  
 লাভ করার ইচ্ছা- লিঙ্গা  
 শুভ ক্ষণে জন্ম যার- ক্ষণজন্মা  
 শত্রুকে/অরিকে দমন করে যে- অরিন্দম  
 শত্রুকে বধ করে যে- শত্রুঘ্ন  
 সম্মুখে অগ্রসর হয়ে অভ্যর্থনা- প্রত্যুদগমন  
 সকলের জন্য প্রয়োজ্য- সর্বজনীন  
 সকলের জন্য হিতকর- সার্বজনীন  
 স্ত্রীর বশীভূত হয় যে- স্ত্রৈণ  
 সেবা করার ইচ্ছা- শুশ্রূষা  
 হনন/হত্যা করার ইচ্ছা- জিঘাংসা  
 হরিণের চামড়া- অজিন  
 হাতির ডাক- বৃংহতি

## পদ

**পদ :** বাক্যে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দকে পদ বলে।

বাক্যে যখন শব্দ ব্যবহৃত হয়, তখন শব্দগুলোর মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য প্রতিটি শব্দের সঙ্গে কিছু অতিরিক্ত শব্দাংশ যুক্ত হয়। এগুলোকে বলে বিভক্তি। যে সব শব্দে আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় কোন বিভক্তি যুক্ত হয়নি, সে সব শব্দেও একটি বিভক্তি যুক্ত হয়। একে প্রথমা বিভক্তি বা শূণ্য বিভক্তি বলে। ব্যাকরণ অনুযায়ী কোন শব্দ বাক্যে ব্যবহৃত হলে তাতে বিভক্তি যুক্ত হতে হয়। আর তাই কোন শব্দ বাক্যে বিভক্তি না নিয়ে ব্যবহৃত হলেও তার সঙ্গে একটি বিভক্তি যুক্ত হয়েছে বলে ধরে নিয়ে তাকে শূণ্য বিভক্তি বলা হয়।

অর্থাৎ, **বিভক্তিয়ুক্ত শব্দকেই পদ বলে।**

পদের প্রকারভেদ : পদ প্রধানত ২ প্রকার- সব্যয় পদ ও অব্যয় পদ।

সব্যয় পদ আবার ৪ প্রকার- বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম ও ক্রিয়া।

অর্থাৎ, **পদ মোট ৫ প্রকার-**

১. বিশেষ্য
২. বিশেষণ
৩. সর্বনাম
৪. ক্রিয়া
৫. অব্যয়

[শব্দের শ্রেণীবিভাগ হলো- তৎসম, অর্ধ-তৎসম, তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি। অন্যদিকে পদের শ্রেণীবিভাগ হলো- বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া ও অব্যয়। দুইটিই ৫ প্রকার।]

যখন পর্যন্ত কোন শব্দ বাক্যে ব্যবহৃত হচ্ছে না, তখনো সেটি কোন পদ নয়। কোন শব্দ কোন পদ হবে তা নির্ভর করে বাক্যে কিভাবে ব্যবহৃত হলো তার উপর। তাই কোন শব্দকে আগেই বিশেষ্য বা বিশেষণ বলে দেয়া ঠিক নয়। যেমন-

তোমার হাতে কি ?

ডাকাত আমার সব হাতিয়ে নিয়েছে।

জঙ্গীরা হাত বোমা মেরে পালিয়ে গেলো।

প্রথম বাক্যে হাত শব্দটি বিশেষ্য। আবার দ্বিতীয় বাক্যে এই হাত শব্দটিই একটু পরিবর্তিত হয়ে ক্রিয়া হয়ে গেছে। আবার তৃতীয় বাক্যেই



আবার হাত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে বিশেষণ হিসেবে।

[তবে প্রশ্নে শুধু শব্দ দিয়ে সেটি কোন পদ জিজ্ঞেস করলে সাধারণত শব্দটি যে পদ হিসেবে ব্যবহৃত হয় সেটি দিতে হবে। এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে, প্রতিটি শব্দই সাধারণত একেক পদ হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার সময় একেক রূপ নেয়। যেমন, ‘হাত’ শব্দটি বিশেষণ হিসেবে কোন বিভক্তি নেয়নি, কিন্তু বিশেষ্য হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার সময় বিভক্তি নিয়েছে। আবার ক্রিয়া হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার সময় প্রত্যয় নিয়েছে। এভাবে প্রশ্নের শব্দটিকে বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহার করে কোন পদ নির্ণয় করা যেতে পারে।]

## বিশেষ্য পদ

কোন কিছুর নামকেই বিশেষ্য বলে।

যে পদ কোন ব্যক্তি, বস্তু, প্রাণী, সমষ্টি, স্থান, কাল, ভাব, কর্ম, গুণ ইত্যাদির নাম বোঝায়, তাকে বিশেষ্য পদ বলে।

বিশেষ্য পদ ৬ প্রকার-

১. নামবাচক বা সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য

(ক) ব্যক্তির নাম : নজরুল, ওমর, আনিস, মাইকেল

(খ) ভৌগোলিক স্থানের নাম : ঢাকা, দিলিল, লন্ডন, মক্কা

(গ) ভৌগোলিক নাম (নদী, পর্বত, সমুদ্র ইত্যাদির নাম) : মেঘনা, হিমালয়, আরব সাগর

(ঘ) গ্রন্থের নাম : গীতাঞ্জলি, অগ্নিবীণা, দেশেবিদেশে, বিশ্বনবী

২. জাতিবাচক বিশেষ্য : (এক জাতীয় প্রাণী বা পদার্থের নাম) মানুষ, গরু, গাছ, পাখি, পর্বত, নদী, ইংরেজ

৩. বস্তুবাচক বা দ্রব্যবাচক বিশেষ্য : বই, খাতা, কলম, থালা, বাটি, মাটি, চাল, চিনি, লবন, পানি

৪. সমষ্টিবাচক বিশেষ্য (ব্যক্তি বা প্রাণীর সমষ্টি) : সভা, জনতা, পঞ্চায়েত, মাহফিল, ঝাঁক, বহর, দল

৫. ভাববাচক বিশেষ্য (ক্রিয়ার ভাব বা কাজের ভাব বা কাজের নাম বোঝায়) : গমন, শয়ন, দর্শন, ভোজন. দেখা, শোনা, যাওয়া, শোয়া

৬. গুণবাচক বিশেষ্য : মধুরতা, তারল্য, তিক্ততা, তারুণ্য, সৌরভ, স্বাস্থ্য, যৌবন, সুখ, দুঃখ

## বিশেষণ পদ

যে পদ বাক্যের অন্য কোন পদের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ করে, তাকে বিশেষণ পদ বলে।

অর্থাৎ, বিশেষণ পদ অন্য কোন পদ সম্পর্কে তথ্য বা ধারণা প্রকাশ করে, বা অন্য পদকে বিশেষায়িত করে।

[কিছু বিশেষণ পদ : (‘একটি ফটোগ্রাফ’ কবিতা থেকে)]

সফেদ দেয়াল

শান্ত ফটোগ্রাফ

জিজ্ঞাসু অতিথি

ছোট ছেলে

নিষ্পৃহ কণ্ঠস্বর

তিনটি বছর (সংখ্যাবাচক বিশেষণ)

রুম্ফ চর

প্রম্বাকুল চোখ

ক্ষীয়মাণ শোক

সহজে হয়ে গেল বলা (ক্রিয়া বিশেষণ)]

[বিশেষণ শব্দ; ভাষা অনুশীলন; একটি ফটোগ্রাফ]

বিশেষণ পদ ২ প্রকার- নাম বিশেষণ ও ভাব বিশেষণ।

নাম বিশেষণ : যে বিশেষণ পদ কোন বিশেষ্য বা সর্বনাম পদকে বিশেষায়িত করে, অর্থাৎ অন্য কোন পদ সম্পর্কে কিছু বলে, তাকে নাম বিশেষণ বলে। যেমন-

- বিশেষ্যের বিশেষণ : নীল আকাশ আর সবুজ মাঠের মাঝ দিয়ে একটি ছোট পাখি উড়ে যাচ্ছে।
- সর্বনামের বিশেষণ : সে রূপবান ও গুণবান।



ভাব বিশেষণ : যে বিশেষণ পদ বিশেষ্য বা সর্বনাম পদ ছাড়া অন্য কোন পদকে বিশেষায়িত করে, অর্থাৎ অন্য কোন পদ সম্পর্কে কিছু বলে, তাকে ভাব বিশেষণ বলে। ভাব বিশেষণ ৪ প্রকার-

- ক্রিয়া বিশেষণ : ধীরে ধীরে বায়ু বয়। পরে এক বার এসো।
- বিশেষণের বিশেষণ (কোন বিশেষণ যদি অন্য একটি বিশেষণকেও বিশেষায়িত করে, তাকে বিশেষণের বিশেষণ বলে) :
- নাম বিশেষণের বিশেষণ : সামান্য একটু দুধ দাও। এ ব্যাপারে সে অতিশয় দুঃখিত।
- ক্রিয়া বিশেষণের বিশেষণ : রকেটটি অতি দ্রুত চলে।
- অব্যয়ের বিশেষণ (অব্যয় পদ বা অব্যয় পদের অর্থকে বিশেষায়িত করে) : খিক তারে, শত খিক নির্লজ্জ যে জন।
- বাক্যের বিশেষণ (কোন পদকে বিশেষায়িত না করে সম্পূর্ণ বাক্যটিকেই বিশেষায়িত করে) : দুর্ভাগ্যক্রমে দেশ আবার নানা সমস্যা জালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। বাস্তবিকই আজ আমাদের কঠিন পরিশ্রমের প্রয়োজন।

[না-বাচক ক্রিয়া বিশেষণ :

নি-

- এখনো দেখ নি তুমি ?
- ফুল কি ফোটে নি সাথে ?
- পুষ্পারতি লভে নি কি ঋতুর রাজন ? রাখি নি সন্ধান
- রহে নি, সে ভুলে নি তো

না-

- বসন্তে বরিয়া তুমি লবে না কি তব বন্দনায় ?
- রচিয়া লহ না আজও গীতি।
- ভুলিতে পারি না কোন মতো।

নাই-

- শুনি নাই, রাখি নি সন্ধান
- নাই হল, না হোক এবারে
- করে নাই অর্থ্য বিরুন ?]

[না-বাচক ক্রিয়া বিশেষণ; ভাষা অনুশীলন; তাহারেই পড়ে মনে]

**নির্ধারক বিশেষণ :** দ্বিরুক্ত শব্দ ব্যবহার করে যখন একের বেশি কোনো কিছুকে বোঝানো হয় তাকে নির্ধারক বিশেষণ বলে। যেমন-

রাশি রাশি ভারি ভারি ধান (সোনার তরী)

লাল লাল কৃষ্ণচূড়ায় গাছ ভরে আছে।

নববর্ষ উপলক্ষে ঘরে ঘরে সাড়া পড়ে গেছে।

এত ছোট ছোট উত্তর লিখলে হবে না।

[নির্ধারক বিশেষণ; ভাষা অনুশীলন; সোনার তরী]

[বিশেষণবাচক ‘কী’

কী-শব্দটির একটি লক্ষণীয় দিক হচ্ছে বিশেষণ হিসেবে এর ব্যবহার।

যেমন, ‘একটি ফটোগ্রাফ’ কবিতায় :

এই যে আসুন, তারপর কী খবর ?

নিজেই চমকে, কী নিস্পৃহ, কেমন শীতল।

কী সহজে হয়ে গেল বলা। (ক্রিয়াবিশেষণের বিশেষণ/ বিশেষণের বিশেষণ)]

[বিশেষণবাচক ‘কী’; ভাষা অনুশীলন; একটি ফটোগ্রাফ]

[বিশেষণ সম্বন্ধ

পাথরের টুকরো

আমাদের গ্রামের পুকুর

গ্রীষ্মের পুকুর



/ExamKaDarrNahi



/info\_EKDN



8276808358

শোকের নদী

আমার সন্তান]

[বিশেষণ সম্বন্ধ; ভাষা অনুশীলন; একটি ফটোগ্রাফ]

## সর্বনাম পদ

বিশেষ্য পদের পরিবর্তে যে পদ ব্যবহৃত হয়, তাকেই সর্বনাম পদ বলে।

অনুচ্ছেদে বা প্যারাগ্রাফে একই বিশেষ্য পদ বারবার আসতে পারে। সে ক্ষেত্রে একই পদ বারবার ব্যবহার করলে তা শুনতে খারাপ লাগাটাই স্বাভাবিক। এই পুনরাবৃত্তি রোধ করার জন্য বিশেষ্য পদের পরিবর্তে অনুচ্ছেদে যে বিকল্প শব্দ ব্যবহার করে সেই বিশেষ্য পদকেই বোঝানো হয়, তাকে সর্বনাম পদ বলে।

[সর্বনাম পদগুলো সব বিশেষ্য বা নামের পরিবর্তে বসতে পারে বলে এদেরকে ‘সর্বনাম’ বলে।]

সর্বনাম পদগুলোকে মূলত ১০ ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

১. ব্যক্তিবাচক বা পুরুষবাচক : আমি, আমরা, তুমি, তোমরা, সে, তারা, তাহারা, তিনি, তাঁরা, এ, এরা, ও, ওরা
২. আত্মবাচক : স্বয়ং, নিজ, খোদ, আপনি
৩. সামীপ্যবাচক : এ, এই, এরা, ইহারা, ইনি
৪. দূরত্ববাচক : ঐ, ঐসব, সব
৫. সাকল্যবাচক : সব, সকল, সমুদয়, তাবৎ
৬. প্রশ্নবাচক : কে, কি, কী, কোন, কাহার, কার, কিসে
৭. অনিদিষ্টতাঙ্গাপক : কোন, কেহ, কেউ, কিছু
৮. ব্যতিহারিক : আপনা আপনি, নিজে নিজে, আপসে, পরস্পর
৯. সংযোগজ্ঞাপক : যে, যিনি, যাঁরা, যাহারা
১০. অন্যাদিবাচক : অন্য, অপর, পর

সাপেক্ষ সর্বনাম : কখনও কখনও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একাধিক সর্বনাম পদ একই সঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে দুটি বাক্যের সংযোগ সাধন করে থাকে। এদেরকে বলা হয় সাপেক্ষ সর্বনাম। যেমন-

যত চাও তত লও (সোনার তরী)

যত চেষ্টা করবে ততই সাফল্যের সম্ভাবনা।

যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা।

যত গর্জে তত বর্ষে না।

যেই কথা সেই কাজ।

যেমন কর্ম তেমন ফল।

যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল।

[সাপেক্ষ সর্বনাম; ভাষা অনুশীলন; সোনার তরী]

## সর্বনামের পুরুষ [PERSON]

[বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের পুরুষভেদে ভিন্ন রূপ দেখা যায়। বিশেষণ ও অব্যয় পদের কোন পুরুষভেদ নেই।]

পুরুষ ৩ প্রকার। সুতরাং, সর্বনাম পদের পুরুষও ৩টি-

**উত্তম পুরুষ** : বাক্যের বক্তাই উত্তম পুরুষ। অর্থাৎ, যেই ব্যক্তি বাক্যটি বলেছে, সেই উত্তম পুরুষ। উত্তম পুরুষের সর্বনামের রূপ হলো- আমি, আমরা, আমাকে, আমাদের, ইত্যাদি।

**মধ্যম পুরুষ** : বাক্যের উদ্দিষ্ট শ্রোতাই মধ্যম পুরুষ। অর্থাৎ, উত্তম পুরুষ যাকে উদ্দেশ্য করে বাক্যটি বলে, এবং পাশাপাশি বাক্যেও উল্লেখ করে, তাকে মধ্যম পুরুষ বলে। অর্থাৎ, প্রত্যক্ষভাবে উদ্দিষ্ট শ্রোতাই মধ্যম পুরুষ। মধ্যম পুরুষের সর্বনামের রূপ হলো- তুমি, তোমরা, তোমাকে, তোমাদের, তোমাদিগকে, আপনি, আপনার, আপনাদের, ইত্যাদি।

**নামপুরুষ** : বাক্যে বক্তা অনুপস্থিত যেসব ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীর উল্লেখ করেন, তাদের নামপুরুষ বলে। অর্থাৎ, বক্তার সামনে নেই এমন



/ExamKaDarrNahi



/info\_EKDN



8276808358



যা কিছু কথ্য বক্তা বাক্যে বলেন, সবগুলোই নামপুরুষ। নাম পুরুষের সর্বনামের রূপ হলো- সে, তারা, তাহারা, তাদের, তাহাকে, তিনি, তাঁকে, তাঁরা, তাঁদের, ইত্যাদি।]

[সমস্ত বিশেষ্য পদই নামপুরুষ।]

## অব্যয় পদ

অব্যয় শব্দকে ভাঙলে পাওয়া যায় ‘ন ব্যয়’, অর্থাৎ যার কোন ব্যয় নেই।

যে পদের কোন ব্যয় বা পরিবর্তন হয় না, তাকে অব্যয় পদ বলে। অর্থাৎ, যে পদ সর্বদা অপরিবর্তনীয় থাকে, যার সঙ্গে কোন বিভক্তি যুক্ত হয় না এবং পুরুষ বা বচন বা লিঙ্গ ভেদে যে পদের রূপের বা চেহারারও কোন পরিবর্তন হয় না, তাকে অব্যয় পদ বলে।

অব্যয় পদ বাক্যে কোন পরিবর্তন ছাড়াই ব্যবহৃত হয় এবং বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে কখনো বাক্যকে আরো শ্রুতিমধুর করে, কখনো একাধিক পদ বা বাক্যাংশ বা বাক্যের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি করে।

বাংলা ভাষায় ৩ ধরনের অব্যয় শব্দ ব্যবহৃত হয়-

১. বাংলা অব্যয় শব্দ : আর, আবার, ও, হাঁ, না

২. তৎসম অব্যয় শব্দ : যদি, যথা, সদা, সহসা, হঠাৎ, অর্থাৎ, দৈবাৎ, বরং, পুনশ্চ, আপাতত, বস্তুত।

‘এবং’ ও ‘সুতরাং’ এই দুটি অব্যয় শব্দও তৎসম, অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষা থেকে এসেছে। তবে এ দুটি অব্যয় শব্দের অর্থ বাংলা ভাষায় এসে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। সংস্কৃতে ‘এবং = এমন’ আর ‘সুতরাং = অত্যন্ত, অবশ্য’

বাংলায় ‘এবং = ও’ আর ‘সুতরাং = অতএব’

৩. বিদেশি অব্যয় শব্দ : আলবত, বহুত, খুব, শাবাশ, খাসা, মাইরি, মারহাবা

অব্যয়ের প্রকারভেদ

অব্যয় পদ মূলত ৪ প্রকার-

১. সমুচ্চয়ী অব্যয় : যে অব্যয় পদ একাধিক পদের বা বাক্যাংশের বা বাক্যের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে, তাকে সমুচ্চয়ী অব্যয় বলে। এই সম্পর্ক সংযোজন, বিয়োজন বা সংকোচন যে কোনটিই হতে পারে। একে সম্বন্ধবাচক অব্যয়ও বলে।

সংযোজক অব্যয় : উচ্চপদ ও সামাজিক মর্যাদা সকলেই চায়। (উচ্চপদ, সামাজিক মর্যাদা- দুটোই চায়)

তিনি সৎ, তাই সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করে। (তাই অব্যয়টি ‘তিনি সৎ’ ও ‘সকলেই তাকে শ্রদ্ধা করে’ বাক্য দুটির মধ্যে সংযোগ ঘটিয়েছে। এরকম- ও, আর, তাই, অধিকন্তু, সুতরাং, ইত্যাদি।

বিয়োজক অব্যয় : আবুল কিংবা আব্দুল এই কাজ করেছে। (আবুল, আব্দুল- এদের একজন করেছে, আরেকজন করেনি। সম্পর্কটি বিয়োগাত্মক, একজন করলে অন্যজন করেনি।)

মস্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। (‘মস্ত্রের সাধন’ আর ‘শরীর পাতন’ বাক্যাংশ দুটির একটি সত্য হবে, অন্যটি মিথ্যা হবে।)

এরকম- কিংবা, বা, অথবা, নতুবা, না হয়, নয়তো, ইত্যাদি।

সংকোচক অব্যয় : তিনি শিক্ষিত, কিন্তু অসৎ। (এখানে ‘শিক্ষিত’ ও ‘অসৎ’ দুটোই সত্য, কিন্তু শব্দগুলোর মধ্যে সংযোগ ঘটেনি। কারণ, বৈশিষ্ট্য দুটো একরকম নয়, বরং বিপরীতধর্মী। ফলে তিনি অসৎ বলে তিনি শিক্ষিত বাক্যাংশটির ভাবের সংকোচ ঘটেছে।)

এরকম- কিন্তু, বরং, তথাপি, যদ্যপি, ইত্যাদি।

২. অনন্বয়ী অব্যয় : যে সব অব্যয় পদ নানা ভাব বা অনুভূতি প্রকাশ করে, তাদেরকে অনন্বয়ী অব্যয় বলে। এগুলো বাক্যের অন্য কোন পদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রেখে স্বাধীনভাবে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন-

উচ্ছ্বাস প্রকাশে : মরি মরি! কী সুন্দর সকাল!

স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি প্রকাশে : হ্যা, আমি যাব। না, তুমি যাবে না।

সম্মতি প্রকাশে : আমি আজ নিশ্চয়ই যাব।

অনুমোদন প্রকাশে : এতো করে যখন বললে, বেশ তো আমি আসবো।



সমর্থন প্রকাশে	: আপনি তো ঠিকই বলছেন।
যন্ত্রণা প্রকাশে	: উঃ! বড্ড লেগেছে।
ঘৃণা বা বিরক্তি প্রকাশে	: ছি ছি, তুমি এতো খারাপ!
সম্বোধন প্রকাশে	: ওগো, তোরা আজ যাসনে ঘরের বাহিরে।
সম্ভাবনা প্রকাশে	: সংশয়ে সংকল্প সদা টলে/ পাছে লোকে কিছু বলে।
বাক্যালাপকার হিসেবে	: কত না হারানো স্মৃতি জাগে আজ মনে।
	: হায়রে ভাগ্য, হায়রে লজ্জা, কোথায় সভা, কোথায় সজ্জা।

৩. অনুসর্গ অব্যয় : যেসব অব্যয় শব্দ বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের বিভক্তির কাজ করে, এবং কারকবাচকতা প্রকাশ করে, তাকে অনুসর্গ অব্যয় বলে। অর্থাৎ, যেই অব্যয় অনুসর্গের মতো ব্যবহৃত হয়, তাকে অনুসর্গ অব্যয় বলে। যেমন-

ওকে দিয়ে এ কাজ হবে না। (এখানে 'দিয়ে' তৃতীয়া বিভক্তির মতো কাজ করেছে, এবং 'ওকে' যে কর্ম কারক, তা নির্দেশ করেছে। এই 'দিয়ে' হলো অনুসর্গ অব্যয়।)

[কারক ও বিভক্তি] [অনুসর্গ]

৪. অনুকার বা ধ্বন্যাশ্রক অব্যয় : বিভিন্ন শব্দ বা প্রাণীর ডাককে অনুকরণ করে যেসব অব্যয় পদ তৈরি করা হয়েছে, তাদেরকে অনুকার বা ধ্বন্যাশ্রক অব্যয় বলে।

মানুষ আদিকাল থেকেই অনুকরণ প্রিয়। তারা বিভিন্ন ধরনের শব্দ, প্রাকৃতিক শব্দ, পশুপাখির ডাক, যেগুলো তারা উচ্চারণ করতে পারে না, সেগুলোও উচ্চারণ করার চেষ্টা করেছে। এবং তা করতে গিয়ে সে সকল শব্দের কাছাকাছি কিছু শব্দ তৈরি করেছে। বাংলা ভাষার এ সকল শব্দকে বলা হয় অনুকার বা ধ্বন্যাশ্রক অব্যয়। যেমন-

বজ্রের ধ্বনি- কড় কড়

তুমুল বৃষ্টির শব্দ- ঝাম ঝাম

স্রোতের ধ্বনি- কল কল

বাতাসের শব্দ- শন শন

নূপুরের আওয়াজ- রুম রুম

সিংহের গর্জন- গর গর

ঘোড়ার ডাক- চিঁহি চিঁহি

কোকিলের ডাক- কুহু কুহু

চুড়ির শব্দ-টুং টাং

শুধু বিভিন্ন শব্দই না, মানুষ তাদের বিভিন্ন অনুভূতিকেও শব্দের আকারে ভাষায় প্রকাশ করার চেষ্টা করেছে। ফলে বিভিন্ন ধরনের অনুভূতি প্রকাশের জন্য তারা বিভিন্ন শব্দ তৈরি করেছে। এগুলোও অনুকার অব্যয়। যেমন-

ঝাঁ ঝাঁ (প্রখরতা)

খাঁ খাঁ (শূণ্যতা)

কচ কচ

কট কট

টল মল

ঝল মল

চক চক

ছম ছম

টন টন

খট খট

কিছু বিশেষ অব্যয়

১. অব্যয় বিশেষণ : কোন অব্যয় বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে বিশেষণের কাজ করলে, তাকে অব্যয় বিশেষণ বলে।



নাম বিশেষণ : অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।

ক্রিয়া বিশেষণ : আবার যেতে হবে।

বিশেষণীয় বিশেষণ : রকেট অতি দ্রুত চলে।

২. নিত্য সম্বন্ধীয় বিশেষণ : কিছু কিছু যুগ্ম অব্যয় আছে, যারা বাক্যে একসাথে ব্যবহৃত হয়, এবং তাদের একটির অর্থ আরেকটির উপর নির্ভর করে। এদের নিত্য সম্বন্ধীয় বিশেষণ বলে। যেমন- যথা-তথা, যত-তত, যখন-তখন, যেমন-তেমন, যে রূপ-সে রূপ, ইত্যাদি।  
উদাহরণ-

যত গর্জে তত বর্ষে না।

যেমন কর্ম তেমন ফল।

৩. ত প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ : ত প্রত্যয়ান্ত কিছু তৎসম অব্যয় বাংলায় ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃততে প্রত্যয়টি ছিল ‘তস্’, বাংলায় তা হয়েছে ‘ত’।  
যেমন- ধর্মত, দুর্ভাগ্যবশত, অন্তত, জ্ঞানত, ইত্যাদি।

প্রত্যয়

মূলশব্দ বা মৌলিক শব্দের সঙ্গে যে অতিরিক্ত শব্দাংশ যুক্ত হয়ে নতুন নামপদ গঠন করে, তাকে প্রত্যয় বলে। [যা ক্রিয়ামূল ও শব্দমূলের সাথে যুক্ত হয়ে নতুন পদ সৃষ্টি করে বা বাক্যস্থ শব্দের ভিতরে সম্পর্ক সৃষ্টিতে সহায়তা করে, এমন ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছকে প্রত্যয় বলা হয়। ইংরেজি suffix, postfix।] অর্থাৎ, প্রাতিপদিক ও ধাতুর সঙ্গে যেই শব্দাংশ যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে, তাদেরকেই প্রত্যয় বলে। উপরের উদাহরণে, লাজুক শব্দের প্রকৃতি ‘লাজ’-এর সঙ্গে প্রত্যয় ‘উক’ যুক্ত হয়ে গঠিত হয়েছে ‘লাজুক’ শব্দটি। এমনিভাবে-  
প্রকৃতি + প্রত্যয় = প্রত্যয়সাধিত শব্দ

- √বড় + আই = বড়াই
- √ঘর + আমি = ঘরামি
- √পড় + উয়া = পড়ুয়া
- √নাচ + উনে = নাচুনে
- √জিত + আ = জিতা
- √চল্ (গমন করা) + ই = চলি
- √অৎ (গমন করা) + ই = অতি (অধিক)

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত প্রত্যয়গুলোকে ভাষাগত প্রকৃতি অনুসারে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। এই ভাগগুলো হলো—

১. সংস্কৃত প্রত্যয় :

এই প্রত্যয়কে মোট পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। এ গুলি হলো—

- কৃৎপ্রত্যয় (Primary suffix)
- তদ্ধিত প্রত্যয় (Secondary suffix)
- স্ত্রী-প্রত্যয় (feminine suffix)
- ধাতুবয়ব (Parts of roots)
- বিভক্তি (Inflection)

২. বাংলা প্রত্যয় :

দেশী প্রত্যয়কেই বলা হয়, বাংলা প্রত্যয়।

৩. বিদেশী প্রত্যয় :

সংস্কৃত ও বাংলা ব্যতীত অন্যান্য প্রত্যয়গুলো বিদেশী প্রত্যয় বলা হয়।

প্রত্যয় : মূলশব্দ বা মৌলিক শব্দের সঙ্গে যে অতিরিক্ত শব্দাংশ যুক্ত হয়ে নতুন নামপদ গঠন করে, তাকে প্রত্যয় বলে। অর্থাৎ, প্রাতিপদিক ও ধাতুর সঙ্গে যেই শব্দাংশ যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে, তাদেরকেই প্রত্যয় বলে। উপরের উদাহরণে, লাজুক শব্দের প্রকৃতি ‘লাজ’-এর সঙ্গে প্রত্যয় ‘উক’ যুক্ত হয়ে গঠিত হয়েছে ‘লাজুক’ শব্দটি। এমনিভাবে

প্রকৃতি + প্রত্যয় = প্রত্যয়সাধিত শব্দ

বড় + আই = বড়াই



ঘর + আমি = ঘরামি  
পড় + উয়া = পড়ুয়া  
নাচ + উনে = নাচুনে  
জিত + আ = জিতা

প্রকৃতি ২ প্রকার-

নাম প্রকৃতি : প্রাতিপদিকের সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত হলে প্রাতিপদিকটিকে নাম প্রকৃতি বলে। যেমন, উপরের লাজ, বড়, ঘর- এগুলো নাম প্রকৃতি।

ক্রিয়া প্রকৃতি : ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত হলে ধাতুটিকে ক্রিয়া প্রকৃতি বলে। যেমন, উপরের  $\sqrt{\text{পড়}}$ ,  $\sqrt{\text{নাচ}}$ ,  $\sqrt{\text{জিত}}$ - এগুলো ক্রিয়া প্রকৃতি।

প্রত্যয় ২ প্রকার-

কৃৎ প্রত্যয় : ক্রিয়া প্রকৃতির সঙ্গে যেই প্রত্যয় যুক্ত হয়, তাকে কৃৎ প্রত্যয় বলে। যেমন, উপরের উদাহরণে, ' $\sqrt{\text{পড়}}$ '-এর সঙ্গে যুক্ত হওয়া 'উয়া', ' $\sqrt{\text{নাচ}}$ '-এর সঙ্গে যুক্ত হওয়া 'উনে' এবং ' $\sqrt{\text{জিত}}$ '-এর সঙ্গে যুক্ত হওয়া 'আ' কৃৎ প্রত্যয়।

তদ্ধিত প্রত্যয় : নাম প্রকৃতির সঙ্গে যেই প্রত্যয় যুক্ত হয়, তাকে তদ্ধিত প্রত্যয় বলে। যেমন, উপরের উদাহরণে, 'লাজ'-এর সঙ্গে যুক্ত হওয়া 'উক', 'বড়'-এর সঙ্গে যুক্ত হওয়া 'আই', 'ঘর'-এর সঙ্গে যুক্ত হওয়া 'আমি' তদ্ধিত প্রত্যয়।

কৃদন্ত পদ : কৃৎ প্রত্যয় সাধিত পদটিকে বলা হয় কৃদন্ত পদ। অর্থাৎ যে নাম পদ (বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ) ক্রিয়ামূল বা ধাতুর সঙ্গে কৃৎ প্রত্যয় যোগ হয়ে গঠিত, তাকে কৃদন্ত পদ বলে। সহজ ভাষায় বলতে গেলে, ক্রিয়ামূল বা ধাতু থেকে গঠিত বিশেষ্য বা বিশেষণ পদকেই কৃদন্ত পদ বলে। যেমন, উপরের পড়ুয়া, নাচুনে, জিতা।

তদ্ধিতান্ত পদ : তদ্ধিত প্রত্যয় সাধিত শব্দকে তদ্ধিতান্ত পদ বলে। যেমন, উপরের লাজুক, বড়াই, ঘরামি।

অনেক সময় কৃৎ প্রত্যয় যুক্ত হওয়ার ক্রিয়া প্রকৃতি বা ধাতুর আদিষ্বর অনেক সময় পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তন যথেষ্টভাবে হয় না, কিছু নিয়ম অনুসরণ করে হয়। কৃৎ প্রত্যয় ব্যবহৃত হওয়ার সময় পরিবর্তন হওয়ার নিয়ম ২টি- গুণ ও বৃদ্ধি।

গুণ :

ই/ঈ-স্থলে এ	$\sqrt{\text{চিন}} + \text{আ} = \text{চেনা}$ , $\sqrt{\text{নী}} + \text{আ} = \text{নেওয়া}$
উ/ঊ-স্থলে ও	$\sqrt{\text{ধু}} + \text{আ} = \text{ধোয়া}$
ঋ-স্থলে অর	$\sqrt{\text{ক}} + \text{তা} = \text{করতা}$ ' ক্রেতা

বৃদ্ধি:

অ-স্থলে আ	$\sqrt{\text{পচ}} + \text{ণক(অক)} = \text{পাচক}$
ই/ঈ-স্থলে ঐ	$\sqrt{\text{শিশু}} + \text{ঋ} = \text{শৈশব}$
উ/ঊ-স্থলে ঔ	$\sqrt{\text{যুব}} + \text{অন} = \text{যৌবন}$
ঋ-স্থলে আর	$\sqrt{\text{ক}} + \text{ঘ্যণ(য-ফলা)} = \text{কার্য}$

ইং : প্রত্যয় প্রাতিপদিক বা ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সময় প্রায়ই সম্পূর্ণ বা অংশ অবস্থায় যুক্ত হয় না; এর কিছু অংশ লোপ পায়। যুক্ত



হওয়ার সময় প্রত্যয়ের কিছু অংশ লোপ পাওয়াকে বলা হয় ইৎ।

সাধারণত বাংলা প্রত্যয় যুক্ত হওয়ার সময় ইৎ হয় না বা লোপ পায় না। অন্যদিকে অধিকাংশ সংস্কৃত প্রত্যয়-ই ইৎ হয়ে বা আংশিক লোপ পেয়ে যুক্ত হয় বা ব্যবহৃত হয়। উচ্চারণ বা ব্যবহার সহজ করার জন্যই এই লোপ পাওয়ার ঘটনা বা ইৎ ঘটে। শব্দের মতো সংস্কৃত প্রত্যয়ও বাংলা ভাষায় পরিবর্তিত হয়ে ব্যবহৃত হয়। আর এই পরিবর্তনের জন্য সংস্কৃত প্রত্যয়ের লোপ পাওয়া-ই ইৎ।

যেমন,  $\sqrt{\text{স্থান}} + \text{অনট} = \sqrt{\text{স্থান}} + \text{অন}(\text{ট ইৎ বা লোপ}) = \text{স্থান}$

কৃৎ প্রত্যয়

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত কৃৎ প্রত্যয় ২ প্রকার- বাংলা কৃৎ প্রত্যয় ও সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়।

### বাংলা কৃৎ প্রত্যয়

প্রত্যয়	শব্দ গঠন	বিশেষ নিয়ম
শূন্য প্রত্যয় (প্রত্যয় ছাড়া কোনো ক্রিয়া প্রকৃতি বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হলে সেখানে শূন্য প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে বলে ধরা হয়।)	জিত্ হার্ ধরপাকড় (ধর ও পাকড় একত্রে ব্যবহৃত হয়েছে)	
অ	$\sqrt{\text{ধর}} + \text{অ} = \text{ধর}$ $\sqrt{\text{মার}} + \text{অ} = \text{মার}$ বিঃদ্র: আধুনিক বাংলায় সর্বত্র অ-প্রত্যয় উচ্চারিত হয় না। যেমন- $\sqrt{\text{হার}} + \text{অ} = \text{হার্}$	দ্বিত্ব প্রয়োগ (আসন্ন সম্ভাব্যতা অর্থে) : $\sqrt{\text{কাঁদ}} + \text{অ} = \text{কাঁদকাঁদ}$ $\sqrt{\text{মর}} + \text{অ} = \text{মরমর}$
অন (ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠনে ব্যবহৃত হয়)	$\sqrt{\text{কাঁদ}} + \text{অন} = \text{কাঁদন}$ $\sqrt{\text{নাচ}} + \text{অন} = \text{নাচন}$ $\sqrt{\text{বাড়}} + \text{অন} = \text{বাড়ন}$ $\sqrt{\text{ঝুল}} + \text{অন} = \text{ঝুলন}$ $\sqrt{\text{দুল}} + \text{অন} = \text{দোলন}$	ধাতুর শেষে 'আ-কার' থাকলে 'ওন' হয়। যেমন- $\sqrt{\text{খা}} + \text{অন} = \text{খাওন}$ $\sqrt{\text{ছা}} + \text{অন} = \text{ছাওন}$ $\sqrt{\text{দে}} + \text{অন} = \text{দেওন}$
অনা	$\sqrt{\text{দুল}} + \text{অনা} = \text{দোলনা}$ $\sqrt{\text{খেল}} + \text{অনা} = \text{খেলনা}$	
অনি/উনি	$\sqrt{\text{চির}} + \text{অনি} = \text{চিরনি}$ > চিরুনি $\sqrt{\text{বাঁধ}} + \text{অনি} = \text{বাঁধুনি}$ $\sqrt{\text{আঁট}} + \text{অনি} = \text{আঁটুনি}$	
অন্ত (বিশেষণ গঠনে ব্যবহৃত হয়)	$\sqrt{\text{উড়}} + \text{অন্ত} = \text{উড়ন্ত}$ $\sqrt{\text{ডুব}} + \text{অন্ত} = \text{ডুবন্ত}$	
অক	$\sqrt{\text{মুড়}} + \text{অক} = \text{মোড়ক}$ $\sqrt{\text{ঝাল}} + \text{অক} = \text{ঝালক}$	
আ	$\sqrt{\text{পড়}} + \text{আ} = \text{পড়া}$ $\sqrt{\text{রাঁধ}} + \text{আ} = \text{রাঁধা}$ $\sqrt{\text{কেন}} + \text{আ} = \text{কেনা ?}$	





	$\sqrt{\text{কাচ+আ}} = \text{কাচা}$ $\sqrt{\text{ফুট+আ}} = \text{ফোটা}$	
আই (ভাববাচক বিশেষ্য গঠনে ব্যবহৃত হয়)	$\sqrt{\text{চড়+আই}} = \text{চড়াই}$ $\sqrt{\text{সিল+আই}} = \text{সিলাই}$	
আও (ভাববাচক বিশেষ্য গঠনে ব্যবহৃত হয়)	$\sqrt{\text{পাকড়+আও}} = \text{পাকড়াও}$ $\sqrt{\text{চ+আও}} = \text{চড়াও}$	
আন(আনো) (প্রয়োজক ধাতু ও কর্মবাচ্যের ধাতুর পরে বসে)	$\sqrt{\text{জানা+আন}} = \text{জানানো}$ $\sqrt{\text{শোনা+আন}} = \text{শোনানো}$ $\sqrt{\text{ভাসা+আন}} = \text{ভাসানো}$ $\sqrt{\text{চাল+আন}} = \text{চালানো/চালান}$ $\sqrt{\text{মান+আন}} = \text{মানান/মানানো}$	
আনি	$\sqrt{\text{জান+আনি}} = \text{জানানি}$ $\sqrt{\text{শুন+আনি}} = \text{শুনানি}$ $\sqrt{\text{উড়+আনি}} = \text{উড়ানি}$ $(\sqrt{\text{উড়+উনি}} = \text{উড়ুনি})$	
আরি/আরী/রি/উরি	$\sqrt{\text{ডুব+আরি/উরি}} = \text{ডুবুরি}$ $\sqrt{\text{ধুন+আরী}} = \text{ধুনারী}$ $\sqrt{\text{পূজা+আরী}} = \text{পূজারী}$	
আল	$\sqrt{\text{মাত+আল}} = \text{মাতাল}$ $\sqrt{\text{মিশ+আল}} = \text{মিশাল}$	
ই	$\sqrt{\text{ভাজ+ই}} = \text{ভাজি}$ $\sqrt{\text{বেড়+ই}} = \text{বেড়ি}$	
ইয়া/ইয়ে	$\sqrt{\text{মর+ইয়া}} = \text{মরিয়া}$ $\sqrt{\text{বল+ইয়ে}} = \text{বলিয়ে}$ $\sqrt{\text{নাচ+ইয়ে}} = \text{নাচিয়ে}$ $\sqrt{\text{গা+ইয়ে}} = \text{গাইয়ে}$ $\sqrt{\text{লিখ+ইয়ে}} = \text{লিখিয়ে}$ $\sqrt{\text{বাজ+ইয়ে}} = \text{বাজিয়ে}$ $\sqrt{\text{ক+ইয়ে}} = \text{কইয়ে}$	
উ	$\sqrt{\text{ডাক+উ}} = \text{ডাকু}$ $\sqrt{\text{ঝাড়+উ}} = \text{ঝাড়ু}$	দ্বিত্বপ্রয়োগ : $\sqrt{\text{উড়+উ}} = \text{উড়ুউড়ু}$
উয়া/ও	$\sqrt{\text{পড়+উয়া}} = \text{পড়ুয়া}$ $\sqrt{\text{উড়+উয়া}} = \text{উড়ুয়া} > \text{উড়ো/}$ $\sqrt{\text{উড়+ও}} = \text{উড়ো}$	
তা (বিশেষণ গঠনে ব্যবহৃত হয়)	$\sqrt{\text{ফির+তা}} = \text{ফিরতা} > \text{ফেরতা}$ $\sqrt{\text{পড়+তা}} = \text{পড়তা}$ $\sqrt{\text{বহ+তা}} = \text{বহতা}$	
তি (বিশেষণ গঠনে ব্যবহৃত হয়)	$\sqrt{\text{ঘাট+তি}} = \text{ঘাটতি}$ $\sqrt{\text{বাড়+তি}} = \text{বাড়তি}$ $\sqrt{\text{কাট+তি}} = \text{কাটতি}$	



	√উঠ+তি = উঠতি	
না (বিশেষ্য গঠনে ব্যবহৃত হয়)	√কাঁদ+না = কাঁদনা > কান্না √রাঁধ+না = রাঁধনা > রান্না √ঝর+না = ঝরনা	

### সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়

প্রত্যয়			শব্দ গঠন	বিশেষ নিয়ম
মূল	ইৎ/লোপ	থাকে		
অনট	ট	অন	√নী+অনট > নে+অন* = নয়ন √শ্র+অনট = শ্রবণ* √স্থা+অনট = স্থান √ভোজ+অনট = ভোজন √নৃত+অন = নর্তন* √দৃশ+অন = দর্শন* √নন্দি+অনট = নন্দন	
কৃত	ক	ত	√জ্ঞা+কৃত = জ্ঞাত √খ্যা+কৃত = খ্যাত	ক) কিছু কিছু ধাতুর শেষে 'ই-কার' যুক্ত হয়। যেমন- √পঠ+কৃত = পঠিত √লিখ+কৃত = লিখিত √বিদ+কৃত = বিদিত √বেষ্ট+কৃত = বেষ্টিত √চল+কৃত = চলিত √পত+কৃত = পতিত √লুপ্ত+কৃত = লুপ্তিত √ক্ষুধ+কৃত = ক্ষুধিত √শিক্ষ+কৃত = শিক্ষিত খ) ধাতুর শেষে 'চ/জ' থাকলে তা 'ক' হয়। যেমন- √মুচ+কৃত = মুক্ত √ভুজ+কৃত = ভুক্ত গ) নিপাতনে সিদ্ধ : √গম+কৃত = গত √গ্রহ+কৃত = গ্রথিত √চুর+কৃত = চূর্ণ √ছিদ+কৃত = ছিন্ন √জন+কৃত = জাত √হন+কৃত = হত √দা+কৃত = দত্ত √দহ+কৃত = দগ্ধ √মুহ+কৃত = মুগ্ধ √যুধ+কৃত = যুদ্ধ √লভ+কৃত = লব্ধ



				$\sqrt{\text{বচ+ক্ত}} = \text{উক্ত}$ $\sqrt{\text{বপ+ক্ত}} = \text{উপ্ত}$ $\sqrt{\text{স্বপ+ক্ত}} = \text{সুপ্ত}$ $\sqrt{\text{সৃজ+ক্ত}} = \text{সৃষ্ট}$
ক্তি	ক	তি	$\sqrt{\text{গম+ক্তি}} = \text{গতি}$	<p>ক) কিছু ধাতুর শেষের ব্যঞ্জন লোপ পায়। যেমন-</p> $\sqrt{\text{মন+ক্তি}} = \text{মতি}$ $\sqrt{\text{রম+ক্তি}} = \text{রতি}$ <p>খ) কিছু ধাতুর প্রথম ব্যঞ্জনে আ-কার যুক্ত হয়। যেমন-</p> $\sqrt{\text{শ্রম+ক্তি}} = \text{শ্রান্তি}$ $\sqrt{\text{শম+ক্তি}} = \text{শান্তি}$ <p>গ) ধাতুর শেষে 'চ/জ' থাকলে তা 'ক' হয়। যেমন-</p> $\sqrt{\text{বচ+ক্তি}} = \text{উক্তি}$ $\sqrt{\text{মুচ+ক্তি}} = \text{মুক্তি}$ $\sqrt{\text{ভজ+ক্তি}} = \text{ভক্তি}$ <p>ঘ) নিপাতনে সিদ্ধ:</p> $\sqrt{\text{বচ+ক্তি}} = \text{উক্তি}$ $\sqrt{\text{গৈ+ক্তি}} = \text{গীতি}$ $\sqrt{\text{সিধ+ক্তি}} = \text{সিদ্ধি}$ $\sqrt{\text{বুধ+ক্তি}} = \text{বুদ্ধি}$ $\sqrt{\text{শক+ক্তি}} = \text{শক্তি}$
তব্য			$\sqrt{\text{ক্+তব্য}} = \text{কর্তব্য}^*$ $\sqrt{\text{দা+তব্য}} = \text{দাতব্য}$ $\sqrt{\text{পঠ+তব্য}} = \text{পঠিতব্য}$	
অনীয়			$\sqrt{\text{ক্+অনীয়}} = \text{করণীয়}^*$ $\sqrt{\text{রক্ষ+অনীয়}} = \text{রক্ষণীয়}$ $\sqrt{\text{দৃশ+অনীয়}} = \text{দর্শনীয়}^*$ $\sqrt{\text{পান+অনীয়}} = \text{পানীয়}$ $\sqrt{\text{শ্র+অনীয়}} = \text{শ্রবণীয়}$ $\sqrt{\text{পালন+অনীয়}} = \text{পালনীয়}$	
তৃচ	চ	তৃ	$\sqrt{\text{দা+তৃচ}} = \text{দাতা}$ $\sqrt{\text{মা+তৃচ}} = \text{মাতা}$ $\sqrt{\text{ক্রী+তৃচ}} = \text{ক্রেতা}$	$\sqrt{\text{যুধ+তৃচ}} = \text{যোদ্ধা}$
গক	গ	অক	$\sqrt{\text{পঠ+গক}} = \text{পাঠক}^\circ$ $\sqrt{\text{গী+গক}} > \text{নৈ+অক} = \text{নায়ক}^\circ$ $\sqrt{\text{গৈ+গক}} = \text{গায়ক}$ $\sqrt{\text{লিখ+গক}} = \text{লেখক}^*$	<p>ক) প্রযোজক ধাতুর শেষে 'ই-কার' থাকলে লোপ পায়-</p> $\sqrt{\text{পূঁজি+গক}} = \text{পূজক}$ $\sqrt{\text{জনি+গক}} = \text{জনক}$ $\sqrt{\text{চালি+গক}} = \text{চালক}$ $\sqrt{\text{স্তাবি+গক}} = \text{স্তাবক}$ <p>খ) ধাতুর শেষে 'আ-কার' থাকলে অতিরিক্ত 'য়' যুক্ত হয়। যেমন-</p> $\sqrt{\text{দা+গক}} = \text{দায়ক}$ $\text{বি} + \sqrt{\text{ধা+গক}} = \text{বিধায়ক}$
ঘ্যণ	ঘ, ণ	য-ফলা	$\sqrt{\text{ক্+ঘ্যণ}} = \text{কার্য} > \text{কার্য}$	

			<p>√ধৃ+ঘ্যণ = ধার্য</p> <p>√বাচ+ঘ্যণ = বাচ্য</p> <p>√ভোজ+ঘ্যণ = ভোজ্য</p> <p>√যোগ+ঘ্যণ = যোগ্য</p> <p>√হাস+ঘ্যণ = হাস্য</p> <p>পরি+√হার+ঘ্যণ = পরিহার্য</p>	
য		য ' য	<p>√দা+য ' √দে+য = দেয়</p> <p>√হা+য ' √হে+য = হেয়</p> <p>বি+√ধা+য = বিধেয়</p> <p>অ+√জি+য = অজেয়</p> <p>পরি+√মা+য = পরিমেয়</p> <p>অনু+√মা+য = অনুমেয়</p>	<p>ক)শেষে ব্যঞ্জন থাকলে য-ফলা হয়। যেমন-</p> <p>√গম+য = গম্য</p> <p>√লভ+য = লভ্য</p>
গিন	গ	ইন'ঈ-কার	<p>√গ্রহ+গিন = গ্রাহী</p> <p>√পা+গিন = পায়ী</p> <p>√কৃ+গিন = কারী</p> <p>√দ্রোহ+গিন = দ্রোহী</p> <p>সত্য+√বাদ+গিন = সত্যবাদী</p> <p>√ভাব+গিন = ভাবী</p> <p>√স্থা+গিন = স্থায়ী</p> <p>√গম+গিন = গামী</p>	<p>'হন' ধাতুর ক্ষেত্রে-</p> <p>√হন+গিন = ঘাতী :</p> <p>আত্ম+√হন+গিন = আত্মঘাতী</p>
ইন		ইন'ঈ-কার	√শ্রম+ইন = শ্রমী	
অল	ল	অ	<p>√জি+অল = জয়</p> <p>√ক্ষি+অল = ক্ষয়</p> <p>√নিচ+অল = নিচয়</p> <p>√বিন+অল = বিনয়</p> <p>√বিল+অল = বিলয়</p>	√হন+অল = বধ
ইক্ষু			<p>√চল+ইক্ষু = চলিষু</p> <p>√ক্ষয়+ইক্ষু = ক্ষয়িষু</p> <p>√বর্ধ+ইক্ষু = বর্ধিষু</p>	
বর			<p>√ঈশ+বর = ঈশ্বর</p> <p>√ভাস+বর = ভাস্বর</p> <p>√নশ+বর = নশ্বর</p> <p>√স্থা+বর = স্থাবর</p>	
র			<p>√হিন+স+র = হিংস্র</p> <p>√নম+র = নম্র</p>	
উক/উক			<p>√ভূ+উক ' ভৌ+উক = ভাবুক</p> <p>√জাগৃ+উক = জাগরুক</p>	
শানচ	শ, চ	আন/মান	<p>√দীপ+শানচ = দীপ্যমান</p> <p>√চল+শানচ = চলমান</p> <p>√বৃধ+শানচ = বর্ধমান</p>	

ঘঞ	ঘ, ঞ	অ	$\sqrt{\text{বস}} + \text{ঘঞ} = \text{বাস}$ $\sqrt{\text{যুজ}} + \text{ঘঞ} = \text{যোগ}$ $\sqrt{\text{ক্রুধ}} + \text{ঘঞ} = \text{ক্রোধ}$ $\sqrt{\text{খদ}} + \text{ঘঞ} = \text{খেদ}$ $\sqrt{\text{ভিদ}} + \text{ঘঞ} = \text{ভেদ}$	$\sqrt{\text{ত্যজ}} + \text{ঘঞ} = \text{ত্যাগ}$ $\sqrt{\text{পচ}} + \text{ঘঞ} = \text{পাক}$ $\sqrt{\text{শুচ}} + \text{ঘঞ} = \text{শোক}$
----	------	---	--	--

\* গুণ হয়েছে।

° বৃদ্ধি হয়েছে।

তদ্ধিত প্রত্যয়

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তদ্ধিত প্রত্যয় ৩ প্রকার। যেমন- বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়, বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয় ও তৎসম বা সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়।

বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়

প্রত্যয়	শব্দ গঠন
আ	$\text{চোর} + \text{আ} = \text{চোরা}$ $\text{কেষ্ট} + \text{আ} = \text{কেষ্টা}$ $\text{ডিঙি} + \text{আ} = \text{ডিঙা}$ $\text{বাঘ} + \text{আ} = \text{বাঘা}$ $\text{হাত} + \text{আ} = \text{হাতা}$ $\text{কাল} + \text{আ} = \text{কাল}$ $\text{জল} + \text{আ} = \text{জলা}$ $\text{গোদ} + \text{আ} = \text{গোদা}$ $\text{রোগ} + \text{আ} = \text{রোগা}$ $\text{চাল} + \text{আ} = \text{চালা}$ $\text{লুন} + \text{আ} = \text{লুনা} \text{ } ^\circ \text{ লোনা}$
আই	$\text{বড়} + \text{আই} = \text{বড়াই}$ $\text{চড়া} + \text{আই} = \text{চড়াই}$ $\text{কানু} + \text{আই} = \text{কানাই}$ $\text{নিম} + \text{আই} = \text{নিমাই}$ $\text{বোন} + \text{আই} = \text{বোনাই}$ $\text{ননদ} + \text{আই} = \text{নন্দাই}$ $\text{জেঠা} + \text{আই} = \text{জেঠাই}$ $\text{মিঠা} + \text{আই} = \text{মিঠাই}$ $\text{ঢাকা} + \text{আই} = \text{ঢাকাই}$ $\text{পাবনা} + \text{আই} = \text{পাবনাই}$ $\text{চোর} + \text{আই} = \text{চোরাই}$ $\text{মোগল} + \text{আই} = \text{মোগলাই}$
আমি/আম/ আমো/মি	$\text{ইতর} + \text{আমি} = \text{ইতরামি}$ $\text{পাগল} + \text{আমি} = \text{পাগলামি}$ $\text{চোর} + \text{আমি} = \text{চোরামি}$ $\text{বাঁদর} + \text{আমি} = \text{বাঁদরামি}$ $\text{ফাজিল} + \text{আমো} = \text{ফাজলামো}$ $\text{ঠক} + \text{আমো} = \text{ঠকামো}$ $\text{ঘর} + \text{আমি} = \text{ঘরামি}$ $\text{জেঠা} + \text{মি} = \text{জেঠামি}$ $\text{ছেলে} + \text{মি} = \text{ছেলেমি}$
ই/ঈ	$\text{বাহাদুর} + \text{ই} = \text{বাহাদুরি}$ $\text{উমেদার} + \text{ই} = \text{উমেদারি}$ $\text{ডাক্তার} + \text{ঈ} = \text{ডাক্তারী}$ $\text{মোক্তার} + \text{ঈ} = \text{মোক্তারী}$ $\text{পোদ্দার} + \text{ঈ} = \text{পোদ্দারী}$ $\text{ব্যাপার} + \text{ঈ} = \text{ব্যাপারী}$ $\text{চাষ} + \text{ঈ} = \text{চাষী}$ $\text{জমিদার} + \text{ঈ} = \text{জমিদারী}$ $\text{দোকান} + \text{ঈ} = \text{দোকানী}$ $\text{ভাগলপুর} + \text{ঈ} = \text{ভাগলপুরী}$ $\text{মাদ্রাজ} + \text{ঈ} = \text{মাদ্রাজী}$ $\text{রেশম} + \text{ঈ} = \text{রেশমী}$ $\text{সরকার} + \text{ঈ} = \text{সরকারী}$
ইয়া ° এ	$\text{সেকাল} + \text{এ} = \text{সেকেলে}$ $\text{একাল} + \text{এ} = \text{একেলে}$ $\text{ভাদর} + \text{ইয়া} = \text{ভাদরিয়া} \text{ } ^\circ \text{ ভাদুরে}$ $\text{খুন} + \text{ইয়া} = \text{খুনিয়া} \text{ } ^\circ \text{ খুনে}$ $\text{না} + \text{ইয়া} = \text{নাইয়া} \text{ } ^\circ \text{ নেয়ে}$ $\text{দেমাক} + \text{এ} = \text{দেমাকে}$





	পাথর+ইয়া = পাথুরিয়া > পাথুরে মাটি+ইয়া = মেটে বালি+ইয়া = বেলে জাল+ইয়া = জালিয়া > জেলে মোট+ইয়া = মুটে	টনটন+এ = টনটনে কনকন+এ = কনকনে গনগন+এ = গনগনে চকচক+এ = চকচকে
উয়া > ও	অুর+উয়া = অুরুয়া > অুরো বাত+উয়া = বাতুয়া > বেতো টাক+উয়া = টাকুয়া > টেকো খড়+ও = খড়ো ধান+উয়া = ধেনো মাঠ+উয়া = মেঠো	গাঁ+উয়া = গাঁইয়া > গাঁয়ো মাছ+উয়া = মাছুয়া > মেছো দাঁত+উয়া = দাঁতো ছাঁদ+উয়া = ছাঁদো তেল+উয়া = তেলো > তেলা কুঁজ+উয়া = কুঁজো
উ	ঢাল+উ = ঢালু	কল+উ = কলু
উক	লাজ+উক = লাজুক মিশ+উক = মিশুক	মিথ্যা+উক = মিথ্যুক
আরি/আরী/ আরু	ভিখ+আরী = ভিখারী শাঁখ+আরী = শাঁখারী	বোমা+আরু = বোমারু
আলি/আলো/ আল'এল	দাঁত+আল = দাঁতাল লাঠি+আল = লাঠিয়াল > লেঠেল তেজ+আল = তেজাল ধার+আল = ধারাল শাঁস+আল = শাঁসাল জমক+আল = জমকালো	দুধ+আল = দুধাল > দুধেল হিম+আল = হিমাল > হিমেল চতুর+আলি = চতুরালি ঘটক+আলি = ঘটকালি সিঁদ+আল'এল = সিঁদেল গাঁজা+আল'এল = গাঁজেল
উরিয়া'উড়িয়া/ উড়ে/রে	হাট+উরিয়া = হাটুরিয়া > হাটুরে সাপ+উড়িয়া = সাপুড়িয়া > সাপুড়ে	কাঠ+উরিয়া = কাঠুরিয়া > কাঠুরে
উড়	লেজ+উড় = লেজুড়	
উয়া/ওয়া'ও	ঘর+ওয়া = ঘরোয়া	জল+উয়া = জলুয়া > জলো
আটিয়া/টে	তামা+আটিয়া = তামাটিয়া > তামাটে ঝগড়া+আটিয়া = ঝগড়াটে	ভাড়া+আটিয়া = ভাড়াটে রোগা+আটিয়া = রোগাটে
অট'ট	ভরা+ট = ভরাট	জমা+ট = জমাট
লা	মেঘ+লা = মেঘলা এক+লা = একলা	আখ+লা = আখলা

### সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়

প্রত্যয়	শব্দ গঠন	বিশেষ নিয়ম
মূল	যুক্ত হয়	
ইত	কুসুম+ইত = কুসুমিত তরঙ্গ+ইত = তরঙ্গিত কণ্টক+ইত = কণ্টকিত	



ইমন	ইমা	নীল+ইমন = নীলিমা মহৎ+ইমন = মহিমা	
ইল		পঙ্ক+ইল = পঙ্কিল উর্মি+ইল = উর্মিল ফেন+ইল = ফেনিল	
ইষ্ঠ		গুরু+ইষ্ঠ = গরিষ্ঠ লঘু+ইষ্ঠ = লঘিষ্ঠ	
ইন/ঈ/ইনী		জ্ঞান+ইন = জ্ঞানিন সুখ+ইন = সুখিন গুণ+ইন = গুণিন মান+ইন = মানিন জ্ঞান+ইনী = জ্ঞানিনী গুণ+ইনী = গুণিনী	জ্ঞান+ইন(ঈ) = জ্ঞানী গুণ+ইন(ঈ) = গুণী
তা/ত্ব		শত্রু+তা = শত্রুতা বন্ধু+তা = বন্ধুতা বন্ধু+ত্ব = বন্ধুত্ব গুরু+ত্ব = গুরুত্ব ঘন+ত্ব = ঘনত্ব মহৎ+ত্ব = মহত্ব	
তর/তম		মধুর+তর = মধুরতর প্রিয়+তর = প্রিয়তর প্রিয়+তম = প্রিয়তম	
নীন	ঈন(ন ইং)	সর্বজন+নীন = সর্বজনীন কুল+নীন = কুলীন নব+নীন = নবীন	
নীয়	ঈয়(ন ইং)	জল+নীয় = জলীয় বায়ু+নীয় = বায়বীয় বর্ষ+নীয় = বর্ষীয়	পর+নীয় = পরকীয় স্ব+নীয় = স্বকীয় রাজা+নীয় = রাজকীয়
বতুপ/মতুপ	বান/মান	গুণ+বতুপ = গুণবান দয়া+বতুপ = দয়াবান শ্রী+মতুপ = শ্রীমান বুদ্ধি+মতুপ = বুদ্ধিমান	
বিন	বী	মেধা+বিন = মেধাবী মায়া+বিন = মায়াবী তেজঃ+বিন = তেজস্বী যশঃ+বিন = যশস্বী	
র		মধু+র = মধুর মুখ+র = মুখর	
ল		শীত+ল = শীতল বৎস+ল = বৎসল	

ষ(অ)	মনু+ষ = মানব যদু+ষ = যাদব শিব+ষ = শৈব জিন+ষ = জৈন শক্তি+ষ = শাক্ত বুদ্ধ+ষ = বৌদ্ধ বিষ্ণু+ষ = বৈষ্ণব শিশু+ষ = শৈশব গুরু+ষ = গৌরব কিশোর+ষ = কৈশোর পৃথিবী+ষ = পার্থিব দেব+ষ = দৈব চিত্র+ষ = চৈত্র	নিপাতনে সিদ্ধ : সূর্য+ষ = সৌর (সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী সুর+ষ = সৌর)
ষ্য(য)	মনুঃ+ষ্য = মনুষ্য জমদগ্নি+ষ্য = জামদগ্ন্য সুন্দর+ষ্য = সৌন্দর্য শূর+ষ্য = শৌর্য ধীর+ষ্য = ধৈর্য কুমার+ষ্য = কৌমার্য পর্বত+ষ্য = পার্বত্য বেদ+ষ্য = বৈদ্য	
ষি(ই)	রাবণ+ষি = রাবণি দশরথ+ষি = দাশরথি	
ষিক(ইক)	সাহিত্য+ষিক = সাহিত্যিক বেদ+ষিক = বৈদিক বিজ্ঞান+ষিক = বৈজ্ঞানিক সমুদ্র+ষিক = সামুদ্রিক নগর+ষিক = নাগরিক মাস+ষিক = মাসিক ধর্ম+ষিক = ধার্মিক সমর+ষিক = সামরিক সমাজ+ষিক = সামাজিক হেমন্ত+ষিক = হৈমন্তিক অকস্মাৎ+ষিক = আকস্মিক	
ষেয়(এয়)	ভগিনী+ষেয় = ভগিনেয় অগ্নি+ষেয় = আগ্নেয় বিমাতৃ+ষেয় = বৈমাত্রেয়	

#### বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয়

প্রত্যয়	শব্দ গঠন
----------	----------



/ExamKaDarrNahi



/info\_EKDN



8276808358

হিন্দি	ওয়ালা'আ লা	বাড়ি+ওয়ালা = বাড়িওয়ালা দিল্লি+ওয়ালা = দিল্লিওয়ালা	মাছ+ওয়ালা = মাছওয়ালা দুধ+ওয়ালা = দুধওয়ালা
	ওয়ান'আন	গাড়ি+ওয়ান = গাড়োয়ান	দার+ওয়ান = দারোয়ান
	আনা'আনি	মুনশী+আনা = মুনশীআনা/মুন্সিয়ানা বিবি+আনা = বিবিআনা/বিবিয়ানা	হিন্দু+আনি = হিন্দুআনি/হিন্দুয়ানি
	পনা	ছেলে+পনা = ছেলেপনা গিল্লী+পনা = গিল্লীপনা	বেহায়া+পনা = বেহায়াপনা
	সা'সে	পানি+সা = পানিসা 'পানসে এক+সা = একসা	কাল+সা = কালসা 'কালসে
ফারসি	গর'কর	কারি+গর = কারিগর বাজি+গর = বাজিগর 'বাজিকর	সওদা+গর = সওদাগর
	দার	খবর+দার = খবরদার তাবে+দার = তাবৈদার বুটি+দার = বুটিদার	দেনা+দার = দেনাদার চৌকি+দার = চৌকিদার পাহারা+দার = পাহারাদার
	বাজ	কলম+বাজ = কলমবাজ ধড়ি+বাজ = ধড়িবাজ	ধোঁকা+বাজ = ধোঁকাবাজ গলা+বাজ = গলাবাজ+ই = গলাবাজি
	বন্দী/বন্দ	জবান+বন্দী = জবানবন্দী সারি+বন্দী = সারিবন্দী	নয়র+বন্দী = নয়রবন্দী কোমর+বন্দ = কোমরবন্দ
সই (মত অর্থে)		জুত+সই = জুতসই মানান+সই = মানানসই চলন+সই = চলনসই টেক+সই = টেকসই	দ্রষ্টব্য : টিপসই ও নামসই- শব্দ দু'টোর 'সই' প্রত্যয় নয়, স্বাধীন শব্দ; সহি'সই (স্বাক্ষর)।

## সমাস

**সমাস:** সমাস শব্দের অর্থ মিলন। অর্থ সম্বন্ধ আছে এমন একাধিক শব্দের মিলিত হয়ে একটি নতুন শব্দ তৈরির ব্যাকরণ সম্মত প্রক্রিয়াকেই বলা হয় সমাস। মূলত, সমাসে একটি বাক্যাংশ একটি শব্দে পরিণত হয়। সমাসের রীতি বাংলায় এসেছে সংস্কৃত ভাষা থেকে।

বাক্যে শব্দের ব্যবহার কমানোর উদ্দেশ্যে সমাস ব্যবহার করা হয়।

উল্লেখ্য, সমাস অর্থ সম্বন্ধপূর্ণ একাধিক শব্দের মিলন। আর সন্ধি পাশাপাশি অবস্থিত দুইটি ধ্বনির মিলন।

সমাসের জন্য কয়েকটি সংজ্ঞা/ টার্মস জানা খুবই জরুরি। এগুলো হলো-

**ব্যাসবাক্য:** যে বাক্যাংশ থেকে সমাসের মাধ্যমে নতুন শব্দ তৈরি হয়, তাকে বলা হয় ব্যাসবাক্য। একে সমাসবাক্য বা বিগ্রহবাক্যও বলা হয়।

**সমস্ত পদ:** ব্যাসবাক্য থেকে সমাসের মাধ্যমে যে নতুন শব্দ তৈরি হয়, তাকে বলা হয় সমস্ত পদ।

**সমস্যমান পদ:** ব্যাসবাক্যের যে সব শব্দ সমস্ত পদে অন্তর্গত থাকে, সমস্ত পদের সেই সব শব্দকে সমস্যমান পদ বলে।

**পূর্বপদ :** সমস্ত পদের প্রথম অংশ/ শব্দকে পূর্বপদ বলে। অর্থাৎ, সমস্ত পদের প্রথম সমস্যমান পদই পূর্বপদ।

**পরপদ/ উত্তরপদ:** সমস্ত পদের শেষ অংশ/ শব্দকে পরপদ/ উত্তরপদ বলে। অর্থাৎ, সমস্ত পদের শেষ সমস্যমান পদই পরপদ।

যেমন, সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন



এখানে ব্যাসবাক্য হলো- ‘সিংহ চিহ্নিত আসন’। আর সমস্ত পদ হলো ‘সিংহাসন’। সমস্যমান পদ হলো ‘সিংহ’ আর ‘আসন’। এদের মধ্যে ‘সিংহ’ পূর্বপদ, আর ‘আসন’ পরপদ।

আবার, আমিষের অভাব = নিরামিষ

এখানে, পূর্বপদ ‘নিঃ’ বা অভাব। আর পরপদ হলো ‘আমিষ’।

উল্লেখ্য, একই সমস্ত পদ কয়েকভাবে ভেঙে কয়েকটি ব্যাসবাক্য তৈরি করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে সঠিক ব্যাসবাক্যও কয়েকটি হতে পারে। সেক্ষেত্রে ব্যাসবাক্য অনুযায়ী সেটি কোন সমাস তা নির্ণয় করতে হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে, ব্যাসবাক্যের সঙ্গে সমস্ত পদের অর্থসঙ্গতি যেন ঠিক থাকে। যেমন, ‘বিপদে আপন্ন = বিপদাপন্ন’, এই সমাসটি এভাবে ভাঙলে তা ভুল হবে। এটা করতে হবে ‘বিপদকে আপন্ন = বিপদাপন্ন’।

**প্রকারভেদ:** সমাস প্রধানত ৬ প্রকার- দ্বন্দ্ব, কর্মধারয়, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি, দ্বিগু ও অব্যয়ীভাব।

তবে অনেকেই দ্বিগু সমাসকে কর্মধারয় সমাসের অন্তর্ভুক্ত করে থাকেন। আবার অনেকে কর্মধারয় সমাসকে তৎপুরুষ সমাসের অন্তর্ভুক্ত করে থাকেন। সমস্যমান পদের অর্থ প্রাধান্য বিবেচনা করে তারা এই মত দিয়ে থাকেন। সমস্যমান পদ বা পূর্বপদ-পরপদের অর্থ প্রাধান্য বিবেচনা করলে মূলত সমাস ৪ প্রকার- দ্বন্দ্ব, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি ও অব্যয়ীভাব।

এছাড়াও কিছু অপ্রধান সমাসও রয়েছে। যেমন- প্রাদি, নিত্য, অলুক, প্রভৃতি।

অর্থ প্রাধান্যের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ :

পূর্বপদের অর্থ প্রাধান্য	পরপদের অর্থ প্রাধান্য	সমাস
আছে	আছে	দ্বন্দ্ব
নেই	আছে	কর্মধারয়, তৎপুরুষ, দ্বিগু
আছে	নেই	অব্যয়ীভাব
নেই	নেই	বহুব্রীহি

নিচে বিভিন্ন সমাসের বর্ণনা দেয়া হলো।

### দ্বন্দ্ব সমাস

যে সমাসে পূর্বপদ ও পরপদ- উভয়েরই অর্থের প্রাধান্য থাকে, তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। এই সমাসে ব্যাসবাক্যে পূর্বপদ ও পরপদের সম্বন্ধ স্থাপনে ও, এবং, আর- এই তিনটি অব্যয় ব্যবহৃত হয়।

যেমন- মা ও বাপ = মা-বাপ। এখানে পূর্বপদ ‘মা’ ও পরপদ ‘বাপ’। ব্যাসবাক্যে ‘মা’ ও ‘বাপ’ দুইজনকেই সমান প্রাধান্য দেয়া হয়েছে, এবং দুজনকেই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, পূর্বপদ ও পরপদ, উভয়েরই অর্থের প্রাধান্য রক্ষিত হয়েছে। তাই এটি দ্বন্দ্ব সমাস।

### কর্মধারয় সমাস

কর্মধারয় সমাসে পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায়। মূলত, এই সমাসে বিশেষণ বা বিশেষ্য ভাবাপন্ন পদ পূর্বপদ ও বিশেষ্য বা বিশেষ্য ভাবাপন্ন পদ পরপদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর ব্যাসবাক্যটিতে ঐ বিশেষ্য বা বিশেষ্য ভাবাপন্ন পদটি সম্পর্কে কিছু বলা হয়। অর্থাৎ পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায়।

যেমন- নীল যে পদ্ম = নীলপদ্ম। এখানে, পূর্বপদ ‘নীল’ বিশেষণ ও পরপদ ‘পদ্ম’ বিশেষ্য। ব্যাসবাক্যে ‘পদ্ম’ সম্পর্কে বলা হয়েছে পদ্মটি ‘নীল’ রঙের। অর্থাৎ, ‘পদ্ম’ বা পরপদের অর্থই এখানে প্রধান, পরপদ ছাড়া পূর্বপদের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। তাই এটি কর্মধারয় সমাস।

কর্মধারয় সমাসের কয়েকটি বিশেষ নিয়ম-

- দুইটি বিশেষণ একই বিশেষ্য বোঝালে সেটি কর্মধারয় সমাস হয়। যেমন, যে চালাক সেই চতুর = চালাক-চতুর। এখানে পরবর্তী বিশেষ্যটি অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে বলে এটি দ্বন্দ্ব সমাস হবে না।
- দুইটি বিশেষ্য একই ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝালে সেটিও কর্মধারয় সমাস হয়। যেমন, যিনি জজ তিনি সাহেব = জজসাহেব। একই কারণে এটি দ্বন্দ্ব না কর্মধারয় হবে।
- কার্যে পরপস্পরা বোঝাতে দুটি কৃদন্ত বিশেষণ বা ক্রিয়াবাচক বিশেষণ পদেও কর্মধারয় সমাস হয়। যেমন, আগে ধোয়া পরে মোছা = ধোয়ামোছা। এখানে ‘মোছা’ কাজটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
- পূর্বপদে স্ত্রীবাচক বিশেষণ থাকলে তা পুরুষবাচক হয়ে যাবে। যেমন, সুন্দরী যে লতা = সুন্দরলতা





- বিশেষণবাচক মহান বা মহৎ শব্দ পূর্বপদ হলে মহা হয়। মহৎ যে জ্ঞান = মহাজ্ঞান
- পূর্বপদে ‘কু’ বিশেষণ থাকলে এবং পরপদের প্রথমে স্বরধ্বনি থাকলে ‘কু’, ‘কৎ’ হয়। যেমন, কু যে অর্থ = কদর্থ।
- পরপদে ‘রাজা’ থাকলে ‘রাজ’ হয়। যেমন, মহান যে রাজা = মহারাজ।
- বিশেষণ ও বিশেষ্য পদে কর্মধারয় সমাস হলে কখনো কখনো বিশেষ্য আগে এসে বিশেষণ পরে চলে যায়। যেমন, সিদ্ধ যে আলু = আলুসিদ্ধ।

কর্মধারয় সমাস মূলত ৪ প্রকার-

**মধ্যপদলোপী কর্মধারয়:** যে কর্মধারয় সমাসের ব্যাসবাক্যের মধ্যবর্তী পদগুলো লোপ পায়, তাকে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন, ‘স্মৃতি রক্ষার্থে সৌধ = স্মৃতিসৌধ’। এখানে ব্যাসবাক্যের মধ্যবর্তী পদ ‘রক্ষার্থে’ লোপ পেয়েছে। পূর্বপদ ‘স্মৃতি’ এখানে বিশেষণ ভাব বোঝাচ্ছে। আর ‘সৌধ’ বিশেষ্য। এটিরই অর্থ প্রধান। সুতরাং এটি মধ্যপদলোপী কর্মধারয়।

(উপমান ও উপমিত কর্মধারয় সমাস আলাদা করে চেনার আগে কতোগুলো সংজ্ঞা/ টার্মস জানা জরুরি। সেগুলো হলো- উপমান, উপমেয় ও সাধারণ ধর্ম। কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর সঙ্গে তুলনা করা হলে যাকে তুলনা করা হলো, তাকে বলা হয় উপমেয়। আর যার সঙ্গে তুলনা করা হয় তাকে বলে উপমান। আর উপমেয় আর উপমানের যে গুণটি নিয়ে তাদের তুলনা করা হয়, সেই গুণটিকে বলা হয় সাধারণ ধর্ম। যেমন, ‘অরুণের ন্যায় রাঙা প্রভাত’। এখানে ‘প্রভাত’কে ‘অরুণ’র মতো ‘রাঙা’ বলে তুলনা করা হয়েছে। সুতরাং, এখানে ‘প্রভাত’ উপমেয়। উপমান হলো ‘অরুণ’। আর প্রভাত আর অরুণের সাধারণ ধর্ম হলো ‘রাঙা’।)

**উপমান কর্মধারয় সমাস:** সাধারণ ধর্মবাচক পদের সঙ্গে উপমান পদের যে সমাস হয়, তাকে উপমান কর্মধারয় সমাস বলে। অর্থাৎ, উপমান ও উপমেয় কর্মধারয়ের মধ্যে যেটিতে সাধারণ ধর্মবাচক পদ থাকবে, সেটিই উপমান কর্মধারয়। যেমন, তুষারের ন্যায় শুভ্র = তুষারশুভ্র। এখানে ‘তুষার’র সঙ্গে কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে তুলনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ এটি উপমান। আর সাধারণ ধর্ম হলো ‘শুভ্র’। উপমেয় এখানে নেই। সুতরাং, এটি উপমান কর্মধারয় সমাস।

**উপমিত কর্মধারয় সমাস:** উপমেয় ও উপমান পদের যে সমাস হয়, তাকে উপমিত কর্মধারয় সমাস বলে। এই সমাসে সাধারণ ধর্ম উল্লেখ করা থাকে না। অর্থাৎ, উপমান ও উপমিত কর্মধারয়ের মধ্যে যেটিতে সাধারণ ধর্মবাচক পদ থাকবে না, সেটিই উপমিত কর্মধারয় সমাস। যেমন, ‘পুরুষ সিংহের ন্যায় = পুরুষসিংহ’। এখানে ‘পুরুষ’কে ‘সিংহ’র সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। অর্থাৎ এখানে ‘পুরুষ’ উপমেয় আর ‘সিংহ’ উপমান। সাধারণ ধর্মের উল্লেখ নেই। সুতরাং, এটি উপমিত কর্মধারয় সমাস।

**রূপক কর্মধারয় সমাস:** উপমান ও উপমেয় পদের মধ্যে অভিন্নতা কল্পনা করা হলে, তাকে রূপক কর্মধারয় সমাস বলে। এটির ব্যাসবাক্যে উপমেয় ও উপমান পদের মাঝে ‘রূপ’ শব্দটি অথবা ‘ই’ শব্দাংশটি ব্যবহৃত হয়। যেমন, ‘মন রূপ মাঝি = মনমাঝি’। এখানে ‘মন’ উপমেয় ও ‘মাঝি’ উপমান। কিন্তু এখানে তাদের কোন নির্দিষ্ট গুণের তুলনা করা হয়নি। মনকেই মাঝি হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে।

## তৎপুরুষ সমাস

যে সমাসে পূর্বপদের শেষের বিভক্তি লোপ পায়, এবং পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায়, তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে। পূর্বপদের যে বিভক্তি লোপ পায়, সেই বিভক্তি অনুযায়ী তৎপুরুষ সমাসের নামকরণ করা হয়। তবে মাঝে মাঝে পূর্বপদের বিভক্তি লোপ না পেয়ে অবিকৃত থেকে যায়। তখন সেটাকে বলা হয় অলুক তৎপুরুষ। (অলুক মানে লোপ না পাওয়া, অ-লোপ)।

যেমন, দুঃখকে প্রাপ্ত = দুঃখপ্রাপ্ত। এখানে পূর্বপদ ‘দুঃখ’র সঙ্গে থাকা দ্বিতীয়া বিভক্তি ‘কে’ লোপ পেয়েছে। আবার পরপদ ‘প্রাপ্ত’র অর্থই এখানে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। দুঃখ প্রাপ্ত হয়েছে বলেই নতুন শব্দের প্রয়োজন হয়েছে, যার জন্য বাক্যাংশটিকে সমাস করে নতুন শব্দ বানানো হয়েছে। অর্থাৎ, এখানে পূর্বপদের শেষের বিভক্তি লোপ পেয়েছে, এবং পরপদের অর্থের প্রাধান্য রক্ষিত হয়েছে। তাই এটি তৎপুরুষ সমাস।

## বহুব্রীহি সমাস

যে সমাসে পূর্বপদ বা পরপদ কোনটিরই অর্থের প্রাধান্য রক্ষিত হয় না, বরং সমস্ত পদ তৃতীয় কোন শব্দকে বোঝায়, তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন, মহান আত্মা যার = মহাত্মা। এখানে পূর্বপদ ‘মহান’ (মহা) ও পরপদ ‘আত্মা’। কিন্তু সমস্ত পদ ‘মহাত্মা’ দ্বারা মহান বা আত্মা কোনটাকেই না বুঝিয়ে এমন একজনকে বোঝাচ্ছে, যিনি মহান, যার আত্মা বা হৃদয় মহৎ। আবার, মহাত্মা বলতে মহাত্মা গান্ধীকেও বোঝানো হয়ে থাকে। কিন্তু কোন অর্থেই পূর্বপদ বা পরপদকে বোঝানো হচ্ছে না। অর্থাৎ, পূর্বপদ বা পরপদ, কোনটিরই অর্থ প্রাধান্য পাচ্ছে না। সুতরাং, এটি বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ।

(উল্লেখ্য, বহুব্রীহি সমাস, বিশেষ করে কিছু ব্যথিকরণ বহুব্রীহি সমাস ও উপপদ তৎপুরুষ সমাসের সমস্ত পদ প্রায় একই ধরনের হয়। ফলে



এদের সমস্ত পদ দেখে আলাদা করে চেনার তেমন কোন উপায় নেই। এগুলোর সমাস নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তাই একই ব্যাসবাক্য ও সমাস নির্ণয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর পরীক্ষায় মূলত এগুলো উপপদ তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ হিসেবেই আসে।)

## দ্বিগু সমাস

দ্বিগু সমাসের সঙ্গে কর্মধারয় সমাসের বেশ মিল রয়েছে। এজন্য একে অনেকেই কর্মধারয় সমাসের অন্তর্ভুক্ত করে থাকেন। দ্বিগু সমাসেও পরপদের অর্থই প্রধান। এবং এই সমাসেও বিশেষণ পদের সঙ্গে বিশেষ্য পদের সমাস হয়। তবে এখানে বিশেষণ পদটি সর্বদাই সংখ্যাবাচক হয়, এবং সমাস হয় সমাহার বা মিলন অর্থে।

অর্থাৎ, সমাহার বা মিলন অর্থে সংখ্যাবাচক বিশেষণের সঙ্গে বিশেষ্য পদের যে সমাস হয়, এবং পরপদের অর্থই প্রাধান্য পায়, তাকে দ্বিগু সমাস বলে। যেমন, ‘অষ্ট ধাতুর সমাহার = অষ্টধাতু’। এখানে পূর্বপদ ‘অষ্ট’ একটি সংখ্যাবাচক বিশেষণ। আর পরপদ ‘ধাতু’ বিশেষ্য। অষ্ট ধাতুর মিলন বা সমাহার অর্থে সমাস হয়ে ‘অষ্টধাতু’ সমস্ত পদটি তৈরি হয়েছে যাতে ‘ধাতু’ সম্পর্কে বলা হয়েছে। অর্থাৎ, পরপদের অর্থ প্রধান হিসেবে দেখা দিয়েছে। সুতরাং, এটি দ্বিগু সমাস।

## অব্যয়ীভাব সমাস

সমাসের পূর্বপদ হিসেবে যদি অব্যয় পদ ব্যবহৃত হয়, এবং সেই অব্যয়ের অর্থই প্রধান হয়, তবে সেই সমাসকে বলা হয় অব্যয়ীভাব সমাস। যেমন, ‘মরণ পর্যন্ত = আমরণ’। এখানে পূর্বপদ হিসেবে পর্যন্ত অর্থে ‘আ’ উপসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে। আর পরপদ ‘মরণ’। কিন্তু এখানে সমস্ত পদটিকে নতুন অর্থ দিয়েছে ‘আ’ উপসর্গটি। অর্থাৎ, এখানে ‘আ’ উপসর্গ বা অব্যয় বা পূর্বপদের অর্থ প্রাধান্য পেয়েছে। তাই এটি অব্যয়ীভাব সমাস। (উপসর্গ এক ধরনের অব্যয়সূচক শব্দাংশ। উপসর্গ বচন বা লিঙ্গ ভেদে পরিবর্তিত হয় না কিংবা বাক্যের অন্য কোন পদের পরিবর্তনেও এর কোন পরিবর্তন হয় না। এরকম আরেকটি অব্যয়সূচক শব্দাংশ হলো অনুসর্গ।)

## প্রাদি সমাস

প্র, প্রতি, অনু, পরি, ইত্যাদি অব্যয় বা উপসর্গের সঙ্গে কৃৎ প্রত্যয় সাধিত বিশেষ্য বা ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যর সমাস হলে তাকে প্রাদি সমাস বলে। যেমন, প্র (প্রকৃষ্ট) যে বচন = প্রবচন। এখানে বচন সমস্যমান পদটি একটি বিশেষ্য, যার মূল (ধাতু) বচ ধাতু বা কৃৎ প্রত্যয়। ‘প্র’ অব্যয়ের সঙ্গে কৃৎ প্রত্যয় সাধিত বিশেষ্য ‘বচন’র সমাস হয়ে সমস্ত পদ ‘প্রবচন’ শব্দটি তৈরি হয়েছে। সুতরাং, এটি প্রাদি সমাস।

## নিত্য সমাস

যে সমাসের সমস্ত পদই ব্যাসবাক্যের কাজ করে, আলাদা করে ব্যাসবাক্য তৈরি করতে হয় না, তাকে নিত্য সমাস বলে। যেমন, অন্য গ্রাম = গ্রামান্তর। এখানে ‘অন্য গ্রাম’ আর ‘গ্রামান্তর’, এই বাক্যাংশ ও শব্দটির মধ্যে তেমন বিশেষকোন পার্থক্য নেই। কেবল ‘অন্য’ পদের বদলে ‘অন্তর’ পদটি ব্যবহার করা হয়েছে। তাই এটি নিত্য সমাস।

শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
বনমধ্যে	বনের মধ্যে	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
প্রাণভয়	প্রাণ যাওয়ার ভয়	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
রথারোহণ	রথে আরোহণ	সপ্তমী তৎপুরুষ
রথচালন	রথকে চালন	দ্বিতীয় তৎপুরুষ
শরনিষ্ক্ষেপ	শরকে নিষ্ক্ষেপ	দ্বিতীয় তৎপুরুষ
	শরের নিষ্ক্ষেপ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
প্রাণবধ	প্রাণের বধ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
অতিমাত্র	মাত্রাকে অতিক্রান্ত	প্রাদি
বেগসংবরণ	বেগকে সংবরণ	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
বজ্রসম	বজ্রের সম	ষষ্ঠী তৎপুরুষ



ক্ষীগজীবী	ক্ষীগভাবে বাঁচে যে	উপপদ তৎপুরুষ
অল্পপ্রাণ	অল্পপ্রাণ যার	বহুব্রীহি
পুত্রলাভ	পুত্রকে লাভ	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
কার্যক্ষতি	কার্যের ক্ষতি	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
অতিথি সৎকার	অতিথির সৎকার	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
ধর্মকার্য	ধর্মবিহিত কার্য	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
ভুজবল	ভুজের বল	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
ভারাপণ	ভারের অর্পণ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
তপোবন	তপের নিমিত্ত বন	চতুর্থী তৎপুরুষ
তপোবনদর্শন	তপোবনকে দর্শন	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
কোটরস্থিত	কোটরে স্থিত	সপ্তমী তৎপুরুষ
মুখভ্রষ্ট	মুখ থেকে ভ্রষ্ট	পঞ্চমী তৎপুরুষ
উপলখণ্ড	উপলের খণ্ড	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
বিস্ময়াপন্ন	বিস্ময়কে আপন্ন	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
কর্ণকুহর	কর্ণের কুহর	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
তপস্বিকন্যা	তপস্বীর কন্যা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
অনতিবৃহৎ	নয় অতি বৃহৎ	নঞ তৎপুরুষ
সেচনকলস	সেচনের নিমিত্ত কলস	চতুর্থী তৎপুরুষ
জলসেচন	জলদ্বারা সেচন	তৃতীয়া তৎপুরুষ
অনসূয়া	নেই অসূয়া (ঈর্ষা) যার	বহুব্রীহি
প্রিয়ংবদা	প্রিয়ম্ (প্রিয়বাক্য) বলে যে (স্ত্রী)	উপপদ
কণ্ঠতনয়া	কণ্ঠের তনয়া	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
মনোহারিণী	মন হরণ করে যে নারী	উপপদ তৎপুরুষ
স্বভাবসিদ্ধ	স্বভাব দ্বারা সিদ্ধ	তৃতীয়া তৎপুরুষ
অঙ্গুলি সংকেত	অঙ্গুলি দ্বারা সংকেত	তৃতীয়া তৎপুরুষ
নবযৌবন	নব যে যৌবন	কর্মধারয়

শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
মমতারস	মমতা মিশ্রিত রস	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
অলসতন্দ্রা	অলস যে তন্দ্রা	কর্মধারয়
মোহনিদ্রা	মোহ রূপ নিদ্রা	রূপক কর্মধারয়
সৈন্যসামন্ত	সৈন্য ও সামন্ত	দ্বন্দ্ব
সংগীতগুঞ্জন	সংগীতের গুঞ্জন	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
ঝরনাধারা	ঝরনার ধারা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
জবাকুসুমসঙ্কাশ	জবাকুসুমের সঙ্কাশ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
তিমিরবিদারী	তিমিরকে বিদীর্ণ করে যা	কর্মধারয়



যৌবনসূর্য	যৌবন রূপ সূর্য	রূপক কর্মধারয়
তিমিরকুন্তলা	তিমিরের ন্যায় কুন্তল যার	উপমিত কর্মধারয়
পাষণস্তুপ	পাষণের স্তুপ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
আলোকপিয়াসী	আলোকের পিয়াসী	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
প্রাণচঞ্চল	প্রাণ চঞ্চল যার	বহুব্রীহি
মেঘলুপ্ত	মেঘে লুপ্ত	সপ্তমী তৎপুরুষ
জয়মুকুট	জয়ের জন্য যে মুকুট	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
মার্তণ্ডপ্রায়	মার্তণ্ডের প্রায়	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
নবপৃথিবী	নব যে পৃথিবী	কর্মধারয়
সলিলসমাধি	সলিলে সমাধি	সপ্তমী তৎপুরুষ

শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
গল্পপ্রেমিক	গল্প প্রেমিক যে	কর্মধারয়
পুষ্পসৌরভ	পুষ্পের সৌরভ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
জ্যোৎস্নারাত	জ্যোৎস্না শোভিত রাত	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
পৃষ্ঠপ্রদর্শন	পৃষ্ঠকে প্রদর্শন	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
দেশভঙ্গ	দেশকে ভঙ্গ	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
জনমানব	জন ও মানব	দ্বন্দ্ব
দেশপলাতক	দেশ থেকে পলাতক	পঞ্চমী তৎপুরুষ
আম-কুড়ানো	আমকে কুড়ানো	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
অনাশ্রিত	নয় আশ্রিত যে	বহুব্রীহি
সমবেদনা-ভরা	সমবেদনা দিয়ে ভরা	তৃতীয়া তৎপুরুষ
মন্দভাগ্য	মন্দ যে ভাগ্য	কর্মধারয়
	মন্দ ভাগ্য যার	বহুব্রীহি
ন্যায়সঙ্গত	ন্যায় দ্বারা সঙ্গত	তৃতীয়া তৎপুরুষ
জীবনসঞ্চার	জীবনের সঞ্চার	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
আবর্জনা-ভরা	আবর্জনা দ্বারা ভরা	তৃতীয়া তৎপুরুষ
গানের আসর	গানের আসর	অলুক ষষ্ঠী তৎপুরুষ
রান্নাঘর	রান্না করা ঘর	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
	রান্নার নিমিত্ত ঘর	চতুর্থী তৎপুরুষ
বেওয়ারিশ	বে (নেই) ওয়ারিশ যার	নঞর্থক বহুব্রীহি
সন্ধ্যাপ্রদীপ	সন্ধ্যার প্রদীপ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
জীবনপ্রদীপ	জীবন রূপ প্রদীপ	রূপক কর্মধারয়
সুখসময়	সুখের সময়	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
গৃহকর্ত্রী	গৃহের কর্ত্রী	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
বাকবিতণ্ডা	বাক দ্বারা বিতণ্ডা	তৃতীয়া তৎপুরুষ



অত্যাচার অবিচার	অত্যাচার ও অবিচার	দ্বন্দ্ব
শ্বাস-প্রশ্বাস	শ্বাস ও প্রশ্বাস	দ্বন্দ্ব
কচুকাটা	কচুর মত কাটা	উপমান কর্মধারয়
অক্ষত	নয় ক্ষত	নঞ তৎপুরুষ
অবিশ্বাস্য	নয় বিশ্বাস্য	নঞ তৎপুরুষ
বেআইনি	বে (নয়) আইনি	নঞ তৎপুরুষ
অপর্যাপ্ত	নয় পর্যাপ্ত	নঞ তৎপুরুষ

শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
শ্রম-কিণাক্ষ-কঠিন	শ্রম-কিণাক্ষের ন্যায় কঠিন	উপমান কর্মধারয়
বন্য-শাপদ-সঙ্কুল	বন্য-শাপদে সঙ্কুল	সপ্তমী তৎপুরুষ
জরা-মৃত্যু-ভীষণা	জরা-মৃত্যুতে ভীষণা	সপ্তমী তৎপুরুষ
ধরণী-মেরী	ধরনী রূপ মেরী	রূপক কর্মধারয়
খেয়াল-খুশি	খেয়াল ও খুশি	দ্বন্দ্ব
জীবন-আবেগ	জীবনের আবেগ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
উদ্ধত-শির	উদ্ধত শির যার	বহুব্রীহি
সিন্ধু-নীর	সিন্ধুর নীর	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
যৌবন-বেগ	যৌবনের বেগ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
মরু-কবি	মরুর কবি	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
বিপ্লব-অভিযান	বিপ্লব ও অভিযান	দ্বন্দ্ব
গরল-পিয়ালা	গরলের পিয়ালা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
গিরি-নিঃস্রাব	গিরি হতে নিঃসৃত যা	বহুব্রীহি
কূপমণ্ডুক	কূপের মণ্ডুক	ষষ্ঠী তৎপুরুষ

## ভাষা

ভাষার সংজ্ঞা বলার আগে আরো কিছু সংজ্ঞা জানা জরুরি।

**বাগযন্ত্র:** মানুষ কথা বলার সময় শরীরের যে সমস্ত অঙ্গ ব্যবহার করে, সেগুলোকেই একত্রে বাগযন্ত্র বলে। মানুষের বাগযন্ত্রের মধ্যে আছে- গলনালী, মুখবিবর, কণ্ঠ, জিহ্বা, তালু, দন্ত বা দাঁত, নাসিকা বা নাক, ওষ্ঠাধর বা ঠোঁট, ইত্যাদি।

**ধ্বনি:** যে কোনো ধরনের আওয়াজকেই ধ্বনি বলা হয়। যেমন, মানুষের ভাষার ক্ষুদ্রতম ধ্বনি, বন্ধুকের ধ্বনি, নুপুরের ধ্বনি, বজ্রপাতের ধ্বনি, গিটারের ধ্বনি, ড্রামসের ধ্বনি, কীবোর্ডে টাইপ করার ধ্বনি, ইত্যাদি।

**কণ্ঠধ্বনি:** মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে যে ধ্বনি সৃষ্টি করে, তাকে কণ্ঠধ্বনি বা ভাষণধ্বনি বলে। এটিই আমাদের ব্যাকরণের আলোচ্য ধ্বনি। ব্যাকরণে আমরা ‘ধ্বনি’ বলতে এই কণ্ঠধ্বনি বা ভাষণধ্বনিকেই বুঝিয়ে থাকি।

এই ধ্বনিই ভাষার মূল উপাদান।

**ভাষা:** বাগযন্ত্রের দ্বারা উচ্চারিত অর্থবোধক ধ্বনির সাহায্যে মানুষের মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যমকেই ভাষা বলে। এই ভাষা বিভিন্ন অঞ্চলের, বিভিন্ন জাতির ও বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের জন্য বিভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন, বাংলাদেশের বাঙালি সংস্কৃতির অধিকারী বাঙালিরা বাংলা ভাষায় কথা বলে। আবার বাংলাদেশে বসবাসকারী বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব ভাষায় কথা বলে।



/ExamKaDarrNahi



/info\_EKDN



8276808358



বর্তমানে পৃথিবীতে ভাষা আছে প্রায় সাড়ে তিন হাজারেরও বেশি (৩৫০০-রও বেশি)।

বাংলা ভাষা

বঙালি সংস্কৃতির অধিকারী বাঙালি জাতি যে ভাষায় তাদের মনের ভাব প্রকাশ করে, সেটিই বাংলা ভাষা।

ভাষাভাষী জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলা পৃথিবীর ৪র্থ বৃহৎ মাতৃভাষা। বর্তমানে, বাংলা ভাষাভাষী জনসংখ্যা প্রায় ২৪ কোটি।

বাংলা ভাষাভাষীরা থাকে- বাংলাদেশে, ভারতের পশ্চিমবঙ্গে, এবং ভারতের ত্রিপুরা, উড়িষ্যা, বিহার ও আসামের কিছু অংশে। তবে এখন প্রবাসী বাংলাদেশি ও প্রবাসী ভারতীয় বাঙালিদের কল্যাণে পৃথিবীর অনেক জায়গাতেই বাংলা ভাষাভাষী মানুষ থাকে।

বাংলা ভাষারীতি

ভাষা নিয়ত পরিবর্তনশীল। প্রতিটি মুহূর্তে ভাষা একটু একটু করে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। প্রয়োজন অনুযায়ী প্রতিটি ভাষাভাষী লোকজন তাদের ভাষার কঠিন শব্দটিকে পাল্টে সহজ করে নিচ্ছে, ছোট করে নিচ্ছে, আবার প্রয়োজনে অন্য ভাষা থেকে নতুন নতুন শব্দ গ্রহণ করছে। শুধু তাই নয়, প্রয়োজনে নানা কৌশল প্রয়োগ করে নতুন নতুন শব্দও তৈরি করছে। এমনকি পুরোনো কোনো শব্দ নতুন অর্থে ব্যবহার করেও শব্দটির নতুন অর্থদ্যোতকতা তৈরি করে নতুন শব্দ তৈরি করা হচ্ছে। বাংলা ভাষায় এই কৌশলে নতুন অর্থপ্রাপ্ত বহুল ব্যবহৃত কিছু শব্দ হচ্ছে- কঠিন ও চরম।

ভাষার এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই একদিন অপভ্রংশ থেকে জন্ম নিয়েছিলো আমাদের প্রিয় মাতৃভাষা বাংলা। আবার এই পরিবর্তনের কারণে বাংলা ভাষায় কিছু পৃথক ভাষারীতিও জন্ম নিয়েছে। বর্তমানে ব্যবহৃত বাংলা ভাষারীতি ২টি- আঞ্চলিক কথ্য রীতি ও প্রমিত চলিত ভাষারীতি।

**প্রমিত চলিত ভাষারীতি:** দেশের সকল মানুষ যে আদর্শ ভাষারীতিতে কথা বলে, যেই ভাষারীতি সকলে বোঝে, এবং যে ভাষায় সকলে শিল্প-সাহিত্য রচনা ও শিক্ষা ও অন্যান্য কাজকর্ম সম্পাদন করে, সেটিই প্রমিত চলিত ভাষারীতি। এই ভাষায় যেমন সাহিত্য সাধনা বা লেখালেখি করা যায়, তেমনি কথা বলার জন্যও এই ভাষা ব্যবহার করা হয়। সকলে বোঝে বলে বিশেষ ক্ষেত্রগুলোতে, যেমন কোনো অনুষ্ঠানে বা অপরিচিত জায়গায় বা আনুষ্ঠানিক (formal) আলাপ-আলোচনার ক্ষেত্রে এই ভাষারীতি ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ, এই রীতি লেখ্য ও কথ্য উভয় রীতিতেই ব্যবহৃত হয়।

বাংলা প্রমিত চলিত ভাষারীতি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ভাগীরথী-তীরবর্তী অঞ্চলের কথ্য ভাষার উপর ভিত্তি করে। তবে, পূর্বে এই ভাষা সাহিত্যের মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত ছিল না। তখন কেবল সাধু ভাষাতেই সাহিত্য রচনা করা হতো। এ কারণে বাংলা সাহিত্যের প্রথম দিকের ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও ছোটগল্পকাররা সাধু ভাষায় উপন্যাস, নাটক ও গল্প লিখেছেন। পরবর্তীতে, প্রমথ চৌধুরী চলিত রীতিতে সাহিত্য রচনার উপর ব্যাপক জোর দেন এবং তাঁর ‘সবুজপত্র’ (১৯১৪) পত্রিকার মাধ্যমে চলিত রীতিতে সাহিত্য রচনাকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

**আঞ্চলিক কথ্য রীতি:** বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ তাদের নিজেদের মধ্যে যে বাংলা ভাষায় কথা বলে, তাকেই আঞ্চলিক কথ্য রীতি বা আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষা বলে। সকল ভাষাতেই আঞ্চলিক ভাষা থাকে। এবং বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মুখের ভাষায় অনেক পার্থক্য দেখা যায়। এগুলো কোনোভাবেই বিকৃত ভাষা নয়, এগুলো শুদ্ধ ও প্রয়োজনীয় আঞ্চলিক ভাষারীতি।

প্রকৃতঅর্থে, প্রমিত চলিত ভাষারীতিও একটি অঞ্চলের কথ্য রীতির উপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কেবল- ভাগীরথী-তীরবর্তী অঞ্চলের কথ্য ভাষাকে তখন প্রমিত ভাষারীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, অন্যগুলোকে প্রমিত ভাষারীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। তবে আঞ্চলিক কথ্য রীতি লেখ্য ভাষা হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, সেটি সর্বজনগ্রাহ্য নয়, সকল অঞ্চলের মানুষ কোনো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা বুঝবে না। তবে কোনো অঞ্চলকে কেন্দ্র করে কোনো সাহিত্য রচিত হলে সেখানে আঞ্চলিক ভাষা আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। সম্পূর্ণ বা পুরোটুকুই আঞ্চলিক ভাষায় রচিত একটি শিল্পসম্মত উপন্যাস হলো হাসান আজিজুল হকের ‘আগুনপাখি’।

বাংলা ভাষায় আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষারীতি আছে; যেটি এখন মৃতপ্রায়, আর ব্যবহৃত হয় না- সাধু ভাষারীতি বা সাধু রীতি।

**সাধু রীতি:** পূর্বে সাহিত্য রচনা ও লেখালেখির জন্য তৎসম শব্দবহুল, দীর্ঘ সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ সম্পন্ন যে গুরুগম্ভীর ভাষারীতি ব্যবহৃত হতো, তাকেই সাধু ভাষা বলে। এই ভাষা অত্যন্ত গুরুগম্ভীর, দুর্কহ এবং এতে দীর্ঘ পদ ব্যবহৃত হয় বলে এই ভাষা কথা বলার জন্য খুব একটা সুবিধাজনক না। তাই এই ভাষায় কথাও বলা হয় না। এই ভাষা কেবল লেখ্য রীতিতে ব্যবহারযোগ্য। তাও বহু আগেই লেখ্য রীতি হিসেবে চলিত রীতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ায় সাধু রীতি এখন লেখ্য ভাষা হিসেবেও ব্যবহৃত হয় না। কেবল সরকারি দলিল-দস্তাবেজ লেখা ও অন্যান্য কিছু দাপ্তরিক কাজে এখনো এই রীতি ব্যবহৃত হয়।

নিচে বাংলা ভাষারীতিগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো:

আঞ্চলিক কথ্য রীতি	প্রমিত চলিত রীতি	সাধু রীতি
-------------------	------------------	-----------



/ExamKaDarrNahi



/info\_EKDN



8276808358

বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মুখের ভাষা	সকলের দ্বারা স্বীকৃত সাহিত্য রচনা, আলাপ-আলোচনা ও শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ভাষারীতি	পূর্বে সাহিত্য রচনা ও লেখার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত গুরুগভীর ও দুরূহ ভাষারীতি
শুধু কথ্য ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়	কথ্য ও লেখ্য উভয় মাধ্যমেই বহুল ব্যবহৃত	শুধু লেখ্য ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়
নির্দিষ্ট অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়	বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত; সকল স্তরে ব্যবহৃত হয়	বর্তমানে ব্যবহৃত হয় না
উপভাষা/নির্দিষ্ট অঞ্চলের ভাষা	সর্বজনস্বীকৃত আদর্শ চলিত রূপ	সর্বজনস্বীকৃত লেখ্য রূপ

নিচে সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্যগুলো সংক্ষেপে দেয়া হলো:

চলিত ভাষা	সাধু ভাষা
তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি শব্দ বেশি ব্যবহৃত হয়। গুরুগভীর তৎসম শব্দ যথাসম্ভব এড়িয়ে যাওয়া হয়। যেমন- রক্ষা(পরিভ্রাণ), সঙ্গ(সমভিব্যাহারে), তীর সংযোগ(শরসন্ধান), আমগাছের নিচে(সহকার তরুতলে)	তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ বেশি ব্যবহৃত হয়। যেমন- পরিভ্রাণ(রক্ষা), সমভিব্যাহারে(সঙ্গে), শরসন্ধান(তীর সংযোগ), সহকার তরুতলে (আমগাছের নিচে)
সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের সহজ ও সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয়, যেটি উচ্চারণ ও ব্যবহার করা আরামদায়ক ও সহজ। যেমন- তার(তদীয়), এরা(ইহারা), আপনার(আপনকার), তাদের(তাহাদিগকে) হলে(হইলে), লাগিলেন(লাগলেন), জিজ্ঞাসিলেন(জিজ্ঞাসা করলেন)	সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের দীর্ঘ পূর্ণাঙ্গ রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন- তদীয়(তার), ইহারা(এরা), আপনকার(আপনার), তাহাদিগকে(তাদের) হইলে(হলে), লাগিলেন(লাগিলেন), জিজ্ঞাসা করলেন(জিজ্ঞাসিলেন)
অপেক্ষাকৃত সহজ বিশেষণ পদ ব্যবহার করা হয়। যেমন- অত্যন্ত(অতিমাত্র), এরূপ(এ রকম), এইরকম(ঈদৃশ), মাদৃশ(আমার মতো), এই অনুযায়ী(এতদনুযায়ী)	অপেক্ষাকৃত কঠিন, দীর্ঘ (বিশেষত তৎসম) বিশেষণ পদ ব্যবহার করা হয়। যেমন- অতিমাত্র(অত্যন্ত), এ রকম(এরূপ), ঈদৃশ(এইরকম), আমার মতো(মাদৃশ), এতদনুযায়ী(এই অনুযায়ী)
সন্ধি ও সমাসবদ্ধ পদকে প্রায়ই ভেঙে ব্যবহার করা হয়। যেমন- বনের মধ্যে (বনমধ্যে), ভার অর্পণ (ভারার্পণ), প্রাণ যাওয়ার ভয় (প্রাণভয়)	সন্ধি ও সমাসবদ্ধ পদ বেশি ব্যবহার করা হয়। যেমন- বনমধ্যে (বনের মধ্যে), ভারার্পণ (ভার অর্পণ), প্রাণভয় (প্রাণ যাওয়ার ভয়)

\* উল্লেখ্য, সাধু ও চলিত রীতিতে কেবলমাত্র অব্যয় পদ অপরিবর্তিতভাবে ব্যবহৃত হয়। সাধু ও চলিত রীতি ভেদে অব্যয় পদের কোনো পরিবর্তন হয় না। এছাড়া আর প্রায় সবধরনের পদ-ই পরিবর্তিত হয়। এমনকি কিছু কিছু অনুসর্গও সাধু ও চলিত রীতিতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যবহৃত হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের প্রশ্ন

- সাধু ও চলিত রীতিতে অভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয় Ñ (ক-২০০৬-০৭)
- বাংলা কোন রীতি এখন বহুল প্রচলিত- (ঘ-২০০০-০১)

## সন্ধি

**সন্ধি** : পাশাপাশি অবস্থিত দুটি ধ্বনির মিলনকে সন্ধি বলে। অর্থাৎ, এখানে দুটি ধ্বনির মিলন হবে, এবং সেই দুটি ধ্বনি পাশাপাশি অবস্থিত হবে। যেমন, ‘নর + অধম = নরাধম’। এখানে ‘নর’র শেষ ধ্বনি ‘অ’ (ন+অ+র+ অ), এবং ‘অধম’র প্রথম ধ্বনি ‘অ’। এখানে ‘অ’ ও ‘অ’ মিলিত হয়ে ‘আ’ হয়েছে। অর্থাৎ পাশাপাশি অবস্থিত দুইটি ধ্বনি ‘অ’ ও ‘অ’ মিলিত হয়ে ‘আ’ হলো।



/ExamKaDarrNahi



/info\_EKDN



8276808358

**সন্ধি ধ্বনির মিলন :** সন্ধি নতুন শব্দ তৈরির একটি কৌশল, তবে এখানে সমাসের মতো নতুনভাবে সম্পূর্ণ শব্দ তৈরি হয় না। কেবল দুটো শব্দ মিলিত হওয়ার সময় পাশাপাশি অবস্থিত ধ্বনি দুটি মিলিত হয়। এই দুটি ধ্বনির মিলনের মধ্য দিয়ে দুটি শব্দ মিলিত হয়ে নতুন একটি শব্দ তৈরি করে। অর্থাৎ শব্দ দুটি মিলিত হয় না, ধ্বনি দুটি মিলিত হয়। উল্লেখ্য, একাধিক শব্দের বা পদের মিলন হলে তাকে বলে সমাস।

**সন্ধির উদ্দেশ্য :** সন্ধি মূলত দুটো উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে করা হয়। সুতরাং যেখানে সন্ধির মাধ্যমে এই দুটি উদ্দেশ্যই পূরণ হবে, সেখানেই কেবল সন্ধি করা যাবে। এগুলো হলো-

১. সন্ধির ফলে উচ্চারণ আরো সহজ হবে (স্বাভাবিক উচ্চারণে সহজপ্রবণতা),
২. সন্ধি করার পর শুনতে আরো ভালো লাগবে (ধ্বনিগত মাধুর্য সম্পাদন)

[সন্ধি পড়ার জন্য **স্পর্শ বর্ণের তালিকা**টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই ধ্বনি প্রকরণ ও উচ্চারণ বিধির অন্তর্গত তালিকাটি এখানে আবারো দেয়া হলো-

নাম	অঘোষ		ঘোষ		নাসিক্য
	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	
ক-বর্গীয় ধ্বনি (কণ্ঠ্য ধ্বনি)	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ-বর্গীয় ধ্বনি (তালব্য ধ্বনি)	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট-বর্গীয় ধ্বনি (মূর্ধন্য ধ্বনি)	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত-বর্গীয় ধ্বনি (দন্ত্য ধ্বনি)	ত	থ	দ	ধ	ন
প-বর্গীয় ধ্বনি (ওষ্ঠ্য ধ্বনি)	প	ফ	ব	ভ	ম

সন্ধি প্রথমত ২ প্রকার- বাংলা শব্দের সন্ধি ও তৎসম সংস্কৃত শব্দের সন্ধি।

খাঁটি বাংলা শব্দ বা তদ্ভব শব্দের যে সন্ধি, সেগুলোকেই বাংলা শব্দের সন্ধি বলে। বাংলা শব্দের সন্ধি ২ প্রকার- স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জনসন্ধি।

**স্বরসন্ধি**

স্বরধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনির মিলনে যে সন্ধি হয়, তাকে বলে স্বরসন্ধি।

বাংলা শব্দের স্বরসন্ধিতে দুটো সন্নিহিত স্বরের একটি লোপ পায়। যেমন,

অ+এ = এ (অ লোপ)	শত+এক = শতেক	কত+এক = কতেক	
আ+আ = আ (একটা আ লোপ)	শাঁখা+আরি = শাঁখারি	রূপা+আলি = রূপালি	
আ+উ = উ (আ লোপ)	মিথ্যা+উক = মিথ্যুক	হিংসা+উক = হিংসুক	নিন্দা+উক = নিন্দুক
ই+এ = ই (এ লোপ)	কুড়ি+এক = কুড়িক	ধনি+ইক = ধনিক	গুটি+এক = গুটিক
	আশি+এর = আশির		

**ব্যঞ্জনসন্ধি**

স্বর আর ব্যঞ্জনে, ব্যঞ্জনে আর ব্যঞ্জনে এবং ব্যঞ্জনে আর স্বরধ্বনিতে যে সন্ধি হয়, তাকে ব্যঞ্জনসন্ধি বলে।

খাঁটি বাংলা শব্দের ব্যঞ্জনসন্ধি মূলত ধ্বনি পরিবর্তনের সমীভবনের নিয়ম মেনে হয়। এবং ব্যঞ্জনসন্ধির ফলে সৃষ্ট শব্দগুলো মূলত কথ্যরীতিতেই সীমাবদ্ধ।

[**সমীভবন** : দুটি ব্যঞ্জনধ্বনির একে অপরের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে সমতা লাভ করলে তাকে সমীভবন বলে। যেমন, ‘জন্ম’ (জ+অ+ন+ম+অ)-এর ‘ন’, ‘ম’-র প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে হয়েছে ‘জন্ম’। সমীভবন মূলত ৩ প্রকার-  
ক. প্রগত সমীভবন : আগের ব্যঞ্জনধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন। যেমন, চক্র’ চক্র, পক্ক’ পক্ক, পদ্ম’ পদ্ম, লগ্ন’ লগ্ন, ইত্যাদি।  
খ. পরাগত সমীভবন : পরের ব্যঞ্জনধ্বনির প্রভাবে আগের ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন। যেমন, তৎ+জন্য’ তজ্জন্য, তৎ+হিত’ তক্তিত, উৎ+মুখ’ উন্মুখ, ইত্যাদি।  
গ. অন্যান্য সমীভবন : পাশাপাশি দুটো ব্যঞ্জনধ্বনি দুইয়ের প্রভাবে দু’টিই পরিবর্তিত হলে তাকে অন্যান্য সমীভবন বলে। যেমন, সত্য (সংস্কৃত)’ সচ্চ (প্রাকৃত), বিদ্যা (সংস্কৃত)’ বিজ্জা (প্রাকৃত), ইত্যাদি।]

১. অঘোষ ধ্বনির পর ঘোষ ধ্বনি আসলে অঘোষ ধ্বনিটিও ঘোষ ধ্বনি হয়ে যাবে। যেমন, ছোট+দা = ছোড়দা।

২. হ্রস্ব র (র) -এর পরে অন্য কোন ব্যঞ্জন ধ্বনি থাকলে ‘র’ লুপ্ত হবে, পরবর্তী ব্যঞ্জনধ্বনি দ্বিগুণ হবে। যেমন, আর+না = আনা, চার+টি = চাটি, ধর+না = ধনা, দুর্+ছাই = দুচ্ছাই

৩. ত-বর্গীয় ধ্বনির (ত, থ, দ, ধ, ন) পরে চ-বর্গীয় ধ্বনি (চ, ছ, জ, ঝ, ঞ) আসলে আগের ধ্বনি লোপ পায়, পরের ধ্বনি (চ-বর্গীয় ধ্বনি) দ্বিগুণ হয়। যেমন, নাত্+জামাই = নাজ্জামাই, বদ্+জাত = বজ্জাত, হাত+ছানি = হাচ্ছানি

৪. ‘প’ এর পরে ‘চ’ এলে আর ‘স’ এর পরে ‘ত’ এলে ‘চ’ ও ‘ত’ এর জায়গায় ‘শ’ হয়। যেমন, পাঁচ+শ = পাঁশশ, সাত+শ = সাশশ, পাঁচ+সিকা = পাঁশসিকা

৫. হ্রস্ব ধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনি যুক্ত হলে স্বরধ্বনিটি লোপ পাবে না। যেমন, বোন+আই = বোনাই, চুন+আরি = চুনারি, তিল+এক = তিলেক, বার+এক = বারেক, তিন+এক = তিনেক

৬. স্বরধ্বনির পরে ব্যঞ্জনধ্বনি এলে স্বরধ্বনিটি লুপ্ত হয়। যেমন, কাঁচা+কলা = কাঁচকলা, নাতি+বৌ = নাতবৌ, ঘোড়া+দৌড় = ঘোড়দৌড়, ঘোড়া+গাড়ি = ঘোড়গাড়ি

## তৎসম শব্দের সন্ধি

তৎসম শব্দ অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষার যে সব শব্দ অবিকৃত অবস্থায় বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়, সে সব শব্দের যে সন্ধি হয়, তাকে বলে তৎসম শব্দের সন্ধি। মূলত সন্ধি বলতে এই তৎসম শব্দের সন্ধিকেই বোঝানো হয়। বাংলা ভাষায় ৩ ধরনের তৎসম শব্দের সন্ধি হয়- স্বরসন্ধি, ব্যঞ্জনসন্ধি ও বিসর্গসন্ধি।

## স্বরসন্ধি

স্বরধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনির সন্ধি হলে তাকে বলে স্বরসন্ধি। নিচে স্বরসন্ধির নিয়মগুলো দেয়া হলো-

১. ‘অ/আ’ এরপরে ‘অ/আ’ থাকলে উভয়ে মিলে ‘আ’ হয় এবং তা প্রথম ‘অ/আ’-র আগের ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়।

অ+অ = আ	নর+অধম = নরাধম	প্রাণ+অধিক = প্রাণাধিক	হিম+অচল = হিমাচল	হস্ত+অন্তর = হস্তান্তর
	হিত+অহিত = হিতাহিত			
অ+আ = আ	হিম+আলয় = হিমালায়	দেব+আলয় = দেবালয়	রত্ন+আকর = রত্নাকর	সিংহ+আসন = সিংহাসন



আ+অ = আ	যথা+অর্থ = যথার্থ	আশা+অতীত = আশাতীত	মহা+অর্ঘ = মহার্ঘ	কথা+অমৃত = কথামৃত
আ+আ = আ	বিদ্যা+আলয় = বিদ্যালয়	কারা+আগার = কারাগার	মহা+আশয় = মহাশয়	সদা+আনন্দ = সদানন্দ

২. ‘অ/আ’ এরপরে ‘ই/ঈ’ থাকলে উভয় মিলে ‘এ’ হয় এবং তা ‘অ/আ’-র আগের ব্যঞ্জননের সঙ্গে যুক্ত হয়।

অ+ই = এ	শুভ+ইচ্ছা = শুভেচ্ছা	পূর্ণ+ইন্দু = পূর্ণেন্দু	স্ব+ইচ্ছা = স্বেচ্ছা	নর+ইন্দ্র = নরেন্দ্র
অ+ঈ = এ	পরম+ঈশ = পরমেশ	নর+ঈশ = নরেশ		
আ+ই = এ	যথা+ইষ্ট = যথেষ্ট			
আ+ঈ = এ	মহা+ঈশ = মহেশ	রমা+ঈশ = রমেশ		

৩. ‘অ/আ’ এরপরে ‘উ/ঊ’ থাকলে উভয়ে মিলে ‘ও’ হয় এবং তা ‘অ/আ’-র আগের ব্যঞ্জননের সঙ্গে যুক্ত হয়।

অ+উ = ও	সূর্য+উদয় = সূর্যোদয়	নীল+উৎপল = নীলোৎপল	ফল+উদয় = ফলোদয়	হিত+উপদেশ = হিতোপদেশ
	পর+উপকার = পরোপকার	প্রশ+উত্তর = প্রশ্নোত্তর		
অ+ঊ = ও	গৃহ+ঊর্ধ্ব = গৃহোর্ধ্ব	চল+ঊর্মি = চলোর্মি	নব+ঊড়া = নবোড়া	
আ+উ = ও	যথা+উচিত = যথোচিত	মহা+উৎসব = মহোৎসব	যথা+উপযুক্ত = যথোপযুক্ত	
আ+ঊ = ও	গঙ্গা+ঊর্মি = গঙ্গোর্মি			

৪. অ/আ এরপরে ঋ কার থাকলে উভয়ে মিলে অর হয় এবং তা ‘অ/আ’-র আগের ব্যঞ্জননের সঙ্গে যুক্ত হয়।

অ+ঋ = অর	দেব+ঋষি = দেবর্ষি	অধম+ঋণ = অধমর্গ	উত্তম+ঋণ = উত্তমর্গ	
আ+ঋ = অর	মহা+ঋষি = মহর্ষি	রাজা+ঋষি = রাজর্ষি		

৫. অ/আ এরপরে ঋত থাকলে অ/আ ও ঋত-র ঋ মিলে আর হয় এবং আর’, ‘অ/আ’-র আগের ব্যঞ্জননের সঙ্গে যুক্ত হয়।

অ+ঋ (ঋত) = আর	শীত+ঋত = শীতর্ত	ভয়+ঋত = ভয়র্ত		
আ+ ঋ (ঋত) = আর	তৃষ্ণা+ঋত = তৃষ্ণর্ত	ক্ষুধা+ঋত = ক্ষুধর্ত		

৬. অ/আ এরপরে এ/ঐ থাকলে উভয়ে মিলে ঐ হয় এবং তা ‘অ/আ’-র আগের ব্যঞ্জননের সঙ্গে যুক্ত হয়।

অ+এ = ঐ	জন+এক = জনৈক	হিত+এষী = হিতৈষী	সর্ব+এব = সর্বৈব	
অ+ঐ = ঐ	মত+ঐক্য = মতৈক্য	অতুল+ঐশ্বর্য = অতুলৈশ্বর্য		
আ+এ = ঐ	সদা+এব = সর্দৈব			
আ+ঐ = ঐ	মহা+ঐশ্বর্য = মহৈশ্বর্য			

৭. অ/আ এরপরে ও/ঔ থাকলে উভয়ে মিলে ঔ হয় এবং তা ‘অ/আ’-র আগের ব্যঞ্জননের সঙ্গে যুক্ত হয়।



অ+ও = ঔ	বন+ওষধি = বনৌষধি			
অ+ঔ = ঔ	পরম+ঔষধ = পরমৌষধ			
আ+ও = ঔ	মহা+ওষধি = মহৌষধি			
আ+ঔ = ঔ	মহা+ঔষধ = মহৌষধ			

৮. ই/ঈ এরপরে ই/ঈ থাকলে উভয়ে মিলে ঈ হয় এবং তা ই/ঈ-র আগের ব্যঞ্জননের সঙ্গে যুক্ত হয়।

ই+ই = ঈ	অতি+ইত = অতীত	গিরি+ইন্দ্র = গিরীন্দ্র	অতি+ইব = অতীব	প্রতি+ইত = প্রতীত
ই+ঈ = ঈ	রবি+ইন্দ্র = রবীন্দ্র			
ই+ঈ = ঈ	পরি+ঈক্ষা = পরীক্ষা	প্রতি+ঈক্ষা = প্রতীক্ষা		
ঈ+ই = ঈ	সতী+ইন্দ্র = সতীন্দ্র	মহী+ইন্দ্র = মহীন্দ্র		
ঈ+ঈ = ঈ	সতী+ঈশ = সতীশ	ক্ষিতী+ঈশ = ক্ষিতীশ	শ্রী+ঈশ = শ্রীশ	পৃথ্বী+ঈশ = পৃথ্বীশ
	দিল্লী+ঈশ্বর = দিল্লীশ্বর			

৯. ই/ঈ এরপরে ই/ঈ ছাড়া অন্য কোন স্বরধ্বনি থাকলে ই/ঈ-র জায়গায় য (য-ফলা, ্য) হয় এবং তা ই/ঈ-র আগের ব্যঞ্জননের সঙ্গে যুক্ত হয়।

ই+অ = য-ফলা + অ	অতি+অন্ত = অত্যন্ত	প্রতি+অহ = প্রত্যহ	অতি+অধিক =	আদি+অন্ত = আদ্যন্ত
	যদি+অপি = যদ্যপি	পরি+অন্ত = পর্যন্ত	অত্যধিক	
ই+আ = য-ফলা + আ	ইতি+আদি = ইত্যাদি	প্রতি+আশা = প্রত্যাশা	প্রতি+আবর্তন =	অতি+আশ্চর্য = অত্যাশ্চর্য
			প্রত্যাবর্তন	
ই+উ = য-ফলা + উ	অতি+উক্তি = অতুক্তি	অভি+উত্থান = অভূত্থান	অগ্নি+উৎপাত =	প্রতি+উপকার =
			অগ্নুৎপাত	প্রতুপকার
ই+ঊ = য-ফলা + ঊ	প্রতি+ঊষ = প্রতুষ			
ঈ+আ = য-ফলা + আ	মসী+আধার = মস্যাধার			
ই+এ = য-ফলা + এ	প্রতি+এক = প্রত্যেক			
ঈ+অ = য-ফলা + অ	নদী+অশ্ব = নদ্যশ্ব			

১০. উ/ঊ এরপরে উ/ঊ থাকলে উভয়ে মিলে ঊ হয় এবং তা উ/ঊ-র আগের ব্যঞ্জননের সঙ্গে যুক্ত হয়।

উ+উ = ঊ	মরু+ঊদ্যান = মরুদ্যান			
উ+ঊ = ঊ	বহু+ঊর্ধ্ব = বহুর্ধ্ব			
ঊ+উ = ঊ	বধূ+ঊৎসব = বধূৎসব			
ঊ+ঊ = ঊ	ভূ+ঊর্ধ্ব = ভূর্ধ্ব			

১১. উ/ঊ এরপরে উ/ঊ ছাড়া অন্য কোন স্বরধ্বনি থাকলে উ/ঊ-র জায়গায় ব (ব-ফলা, ব) হয় এবং তা ই/ঈ-র আগের ব্যঞ্জননের সঙ্গে যুক্ত হয়।



উ+অ = ব-ফলা+অ	সু+অল্প = স্বল্প	পশু+অধম = পশ্বধম	অনু+অয় = অষয়	মনু+অন্তর = মন্বন্তর
উ+আ = ব-ফলা+আ	সু+আগত = স্বাগত	পশু+আচার = পশ্বাচার		
উ+ই = ব-ফলা+ই	অনু+ইত = অষিত			
উ+ঈ = ব-ফলা+ঈ	তনু+ঈ = তষী			
উ+এ = ব-ফলা+এ	অনু+এষণ = অষেষণ			

১২. ঋ এরপরে ঋ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনি থাকলে ঋ এর জায়গায় র (র-ফলা, ঁ ) এবং র-ফলা ঋ এর আগের ব্যঞ্জননের সঙ্গে যুক্ত হয়।

যেমন, পিতৃ(প+ই+তঋ) + আলয় = পিত্রালয়

পিতৃ + আদেশ = পিত্রাদেশ

১৩. (ক) এ/ঐ এরপরে অন্য কোন স্বরধ্বনি আসলে ‘এ’ এর জায়গায় ‘অয়’ এবং ‘ঐ’ এর জায়গায় ‘আয়’ হয়।

এ+অ = অয়+অ	নে+অন = নয়ন	শে+অন = শয়ন
ঐ+অ = আয়+অ	নৈ+অক = নায়ক	গৈ+অক = গায়ক

(খ) ও/ঔ এরপরে অন্য কোন স্বরধ্বনি আসলে ‘ও’ এর জায়গায় ‘অব’ এবং ‘ঔ’ এর জায়গায় ‘আব’ হয়।

ও+অ = অব+অ	পো+অন = পবন	লো+অন = লবন
ঔ+অ = আব+অ	পৌ+অক = পাবক	
ও+আ = অব+আ	গো+আদি = গবাদি	
ও+এ = অব+এ	গো+এষণা = গবেষণা	
ও+ই = অব+ই	পো+ইত্র = পবিত্র	
ঔ+ই = আব+ই	নৌ+ইক = নাবিক	
ঔ+উ = আব+উ	ভৌ+উক = ভাবুক	

১৪. যেসব স্বরসন্ধি নিয়ম মানে না, নিয়ম ভেঙে সন্ধি হয় তাদের **নিপাতনে সিদ্ধ** সন্ধি বলে। যেমন, ‘কুল+অটা’ সন্ধি করে হওয়ার কথা ‘কুলাটা’ (অ+অ = আ)। কিন্তু সন্ধি হওয়ার পর তা হয়ে গেছে ‘কুলটা’। তাই এটা **নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি**। যেমন-

নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি	
কুল+অটা = কুলটা (কুলাটা নয়)	গো+অক্ষ = গবাক্ষ (গবাক্ষ নয়)
প্র+উড় = প্রৌড় (প্রোড় নয়)	অন্য+অন্য = অন্যান্য (অন্যোন্য নয়)
মার্ত+অন্ড = মার্তন্ড (মার্তান্ড নয়)	শুদ্ধ+ওদন = শুদ্ধোদন (শুদ্ধৌদন নয়)

ব্যঞ্জনসন্ধি

যে দুইটি ধ্বনির মিলনে সন্ধি হবে, তাদের একটিও যদি ব্যঞ্জনধ্বনি হয়, তাহলেই সেই সন্ধিকে ব্যঞ্জনসন্ধি বলা হয়। ব্যঞ্জনসন্ধি ৩ ভাবে হতে পারে-

১. স্বরধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি

২. ব্যঞ্জনধ্বনি + স্বরধ্বনি



/ExamKaDarrNahi



/info\_EKDN



8276808358

### ৩. ব্যঞ্জনধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি

#### স্বরধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি

১. স্বরধ্বনির পর 'ছ' থাকলে তা দ্বিত্ব হয়, অর্থাৎ 'ছ'-র বদলে 'চ্ছ' হয়। যেমন-

অ+ছ = চ্ছ	এক+ছত্র = একচ্ছত্র	মুখ+ছবি = মুখচ্ছবি	অঙ্গ+ছেদ = অঙ্গচ্ছেদ	আলোক+ছটা = আলোকচ্ছটা
আ+ছ = চ্ছ	প্র+ছদ = প্রাচ্ছদ	বৃক্ষ+ছায়া = বৃক্ষছায়া	স্ব+ছন্দ = স্বাচ্ছন্দ	
ই+ছ = চ্ছ	কথা+ছলে = কথাচ্ছলে	আচ্ছা+দন = আচ্ছাদন		
উ+ছ = চ্ছ	পরি+ছদ = পরিচ্ছদ	বি+ছেদ = বিচ্ছেদ	পরি+ছদ = পরিচ্ছদ	বি+ছিন্ন = বিচ্ছিন্ন
	প্রতি+ছবি = প্রতিচ্ছবি			
	অনু+ছেদ = অনুচ্ছেদ			

#### ব্যঞ্জনধ্বনি + স্বরধ্বনি

১. ক, চ, ট, ত, প থাকলে এবং তাদের পরে স্বরধ্বনি থাকলে সেগুলো যথাক্রমে গ, জ, ড (ড়), দ, ব হয়।

অর্থাৎ অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনির (ক, চ, ট, ত, প) পরে স্বরধ্বনি থাকলে সেগুলো ঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি (গ, জ, ড (ড়), দ, ব) হয়ে যায়।

অর্থাৎ কোনো বর্ণের প্রথম ধ্বনির (ক, চ, ট, ত, প) পরে স্বরধ্বনি থাকলে সেগুলো সেই বর্ণের তৃতীয় ধ্বনি (গ, জ, ড (ড়), দ, ব) হয়ে যায়। যেমন-

ক্+অ = গ+অ	দিক্+অন্ত = দিগন্ত		
ক্+আ = গ+আ	বাক্+আড়ম্বর = বাগাড়ম্বর		
ক্+ঈ = গ+ঈ	বাক্+ঈশ = বাগীশ		
চ্+অ = জ+অ	গিচ্+অন্ত = গিজন্ত		
ট্+আ = ড+আ	ষট্+আনন = ষড়ানন		
ত্+অ = দ+অ	তৎ+অবধি = তদবধি	কৃৎ+অন্ত = কৃদন্ত	
ত্+আ = দ+আ	সৎ+আনন্দ = সদানন্দ		
ত্+ই = দ+ই	জগৎ+ইন্দ্র = জগদিন্দ্র		
ত্+উ = দ+উ	সৎ+উপায় = সদুপায়	সৎ+উপদেশ = সদুপদেশ	
প্+অ = ব+অ	সুপ্+অন্ত = সুবন্ত		

#### ব্যঞ্জনধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি

১. ক) 'ত/দ' এরপরে 'চ/ছ' থাকলে উভয়ে মিলে 'চ্চ/চ্ছ' হয়। যেমন-

ত্+চ = চ্চ	সৎ+চিন্তা = সচ্চিন্তা	উৎ+চারণ = উচ্চারণ	শরৎ+চন্দ্র = শরচ্চন্দ্র
	সৎ+চরিত্র = সচ্চরিত্র	সৎ+চিদানন্দ (চিৎ+আনন্দ) = সচ্চিদানন্দ	
ত্+ছ = চ্ছ	উৎ+ছেদ = উচ্ছেদ	তৎ+ছবি = তচ্ছবি	



দ+চ = চ্চ	বিপদ+চয় = বিপচ্চয়		
দ+ছ = চ্ছ	বিপদ+ছায়া = বিপচ্ছায়া		

খ) 'ত/দ' এরপরে 'জ/ঝ' থাকলে উভয়ে মিলে 'জ্জ/জ্ঝ' হয়। যেমন-

ত+জ = জ্জ	সৎ+জন = সজ্জন	উৎ+জ্বল = উজ্জ্বল	তৎ+জন্য = তজ্জন্য
	যাবৎ+জীবন = যাবজ্জীবন	জগৎ+জীবন = জগজ্জীবন	
দ+জ = জ্জ	বিপদ+জাল = বিপজ্জাল		
ত+ঝ = জ্ঝ	কুৎ+ঝটিকা = কুজ্ঝটিকা		

গ) 'ত/দ' এরপরে 'শ' থাকলে উভয়ে মিলে 'চ্ছ' হয়। যেমন-

ত+শ = চ+ছ = চ্ছ	উৎ+শ্বাস = উচ্ছ্বাস	চলৎ+শক্তি = চলচ্ছক্তি	উৎ+শৃঙ্খল = উচ্ছৃঙ্খল
-----------------	---------------------	-----------------------	-----------------------

ঘ) 'ত/দ' এরপরে 'ড/ঢ' থাকলে উভয়ে মিলে 'ড্ঢ' হয়। যেমন-

ত+ড = ড্ঢ	উৎ+ডীন = উড্ঢীন		
ত+ঢ = ড্ঢ	বৃহৎ+ঢক্কা = বৃহড্ঢক্কা		

ঙ) 'ত/দ' এরপরে 'হ' থাকলে উভয়ে মিলে 'দ্ধ' হয়। যেমন-

ত+হ = দ্ধ	উৎ+হার = উদ্ধার	উৎ+হাত = উদ্ধত	উৎ+হত = উদ্ধত
দ+হ = দ্ধ	পদ+হতি = পদ্ধতি	তদ্+হিত = তদ্ধিত	

চ) 'ত/দ' এরপরে 'ল' থাকলে উভয়ে মিলে 'ল্ল' হয়। যেমন-

ত+ল = ল্ল	উৎ+লাস = উল্লাস	উৎ+লেখ = উল্লেখ	উৎ+লিখিত = উল্লিখিত
	উৎ+লেখ্য = উল্লেখ্য	উৎ+লঙ্ঘন = উল্লঙ্ঘন	

২. কোনো অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনির পরে ঘোষ ধ্বনি আসলে অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনিটি তার নিজের বর্গের ঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি হয়। অর্থাৎ, ক, চ, ট, ত, প- এদের পরে গ, জ, ড, দ, ব কিংবা ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ কিংবা য, র, ব থাকলে প্রথম ধ্বনি (ক, চ, ট, ত, প) তার নিজের বর্গের তৃতীয় ধ্বনি (গ, জ, ড, দ, ব) হয়ে যায়।

অর্থাৎ, বর্গের প্রথম ধ্বনিগুলোর কোনোটি থাকলে, এবং তার পরে বর্গের তৃতীয় বা চতুর্থ ধ্বনিগুলোর কোনোটি বা য, র, ব (এরা সবাই ঘোষ ধ্বনি) আসলে বর্গের প্রথম ধ্বনি তার নিজ বর্গের তৃতীয় ধ্বনি হয়। যেমন-

ক+দ = গ+দ	বাক+দান = বাগদান	বাক+দেবী = বাগদেবী	
ক+ব = গ+ব	দিক+বিজয় = দিগ্বিজয়		
ক+জ = গ+জ	বাক+জাল = বাগ্জাল		
ট+য = ড+য	ষট্+যন্ত্র = ষড়যন্ত্র		
ত+গ = দ+গ	উৎ+গার = উদগার	উৎ+গিরণ = উদিগিরণ	সৎ+গুরু = সদ্গুরু



ত+ঘ = দ+ঘ	উৎ+ঘাটন = উদ্ঘাটন		
ত+ভ = দ+ভ	উৎ+ভব = উদ্ভব		
ত+য = দ+য	উৎ+যোগ = উদ্যোগ	উৎ+যম = উদ্যম	
ত+ব = দ+ব	উৎ+বন্ধন = উদ্বন্ধন		
ত+র = দ+র	তৎ+রূপ = তদ্রূপ		

৩. নাসিক্য ধ্বনির পরে অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি আসলে অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনিটি নিজ বর্গের ঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি বা নাসিক্য ধ্বনি হয়ে যায়।

অর্থাৎ, ঙ, ঞ, ণ, ন, ম- এদের পরে ক, চ, ট, ত, প থাকলে ক, চ, ট, ত, প যথাক্রমে গ, জ, ড, ব অথবা ঙ, ঞ, ণ, ন, ম হয়ে যায়।

অর্থাৎ, বর্গের পঞ্চম/ শেষ ধ্বনির পরে বর্গের প্রথম ধ্বনি আসলে বর্গের প্রথম ধ্বনি তার নিজ বর্গের তৃতীয় বা পঞ্চম/ শেষ ধ্বনি হয়ে যায়।

ক+ন = গ/ঙ+ন	দিক+নির্ণয় = দিগনির্ণয়/ দিঙনির্ণয়		
ক+ম = গ/ঙ+ম	বাক+ময় = বাঙময়		
ত+ন = দ/ন+ন	জগৎ+নাথ = জগন্নাথ	উৎ+নয়ন = উন্নয়ন	উৎ+নীত = উন্নীত
ত+ম = দ/ন+ম	তৎ+মধ্যে = তদমধ্যে/ তন্মধ্যে	মৃৎ+ময় = মৃন্ময়	তৎ+ময় = তন্ময়
	চিৎ+ময় = চিন্ময়		

উল্লেখ্য, এক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়েই ঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনির চেয়ে নাসিক্য ধ্বনিই অধিক প্রচলিত।

৪. ‘ম’-এর পরে কোনো বর্গীয় ধ্বনি বা স্পর্শ ধ্বনি আসলে ‘ম’ তার পরের ধ্বনির নাসিক্য ধ্বনি হয়ে যায়।

অর্থাৎ, ‘ম’-এর পরে যে বর্গীয় ধ্বনি আসে, ‘ম’ সেই ধ্বনির বর্গের পঞ্চম ধ্বনি হয়ে যায়।

ম+ক = ঙ+ক	শম+কা = শঙ্কা	ম+ভ = ম+ভ	কিম+ভূত = কিম্ভূত
ম+চ = ঞ+চ	সম+চয় = সঞ্চয়	ম+ন = ন	কিম+নর = কিন্নর
ম+ত = ন+ত	সম+তাপ = সন্তাপ		সম+ন্যাস = সন্ম্যাস
ম+দ = ন+দ	সম+দর্শন = সন্দর্শন	ম+থ = ক্	সম+ধান = সন্ধান

উল্লেখ্য, আধুনিক বাংলায় ‘ম’-এর পরে ক-বর্গীয় ধ্বনি থাকলে ক-বর্গের নাসিক্য/ পঞ্চম ধ্বনি ‘ঙ’-র বদলে ‘ং’ হয়। যেমন, ‘সম+গত’-এ ‘ম’ ও ‘গ (ক-বর্গীয় ধ্বনি)’ সন্ধি হয়ে ‘ম’, ‘ঙ’ না হয়ে ‘ং’ হয়ে ‘সংগত’। এরকম-

অহম+কার = অহংকার

সম+খ্যা = সংখ্যা

৫. ‘ম’-এর পরে অন্তঃস্থ ধ্বনি (য, র, ল, ব) কিংবা উষ্ম ধ্বনি (শ, ষ, স, হ) থাকলে ‘ম’-এর জায়গায় ‘ং’ হয়।

সম+যম = সংযম	সম+বাদ = সংবাদ	সম+রক্ষণ = সংরক্ষণ	সম+লাপ = সংলাপ
সম+শয় = সংশয়	সম+সার = সংসার	সম+হার = সংহার	বারম+বার = বারংবার
কিম+বা = কিংবা	সম+বরণ = সংবরণ	সম+যোগ = সংযোগ	সম+যোজন = সংযোজন
সম+শোধন = সংশোধন	সর্বম+সহা = সর্বংসহা	স্বয়ম+বরা = স্বয়ম্বরা	

উল্লেখ্য, এই নিয়মের একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম- সম+রাট = সম্রাট।



৬. তালব্য অল্পপ্রাণ ধ্বনির পরে নাসিক্য ধ্বনি আসলে নাসিক্য ধ্বনিটিও তালব্য নাসিক্য ধ্বনি হয়।  
অর্থাৎ, ‘চ/জ’ এর পরে ঙ, ঞ, ণ, ন, ম (নাসিক্য ধ্বনি) থাকলে সেগুলো ‘ঞ’ হয়ে যায়।

চ+ন = চ+ঞ	যাচ+না = যাদ্ধা	রাজ+নী = রাজ্জী	
জ+ন = জ+ঞ	যজ+ন = যজ্ঞ		

৭. ‘দ/ধ’-এর পরে অঘোষ বর্গীয় ধ্বনি থাকলে ‘দ/ধ’ এর জায়গায় ‘ত’ (অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি) হয়।  
অর্থাৎ, ‘দ/ধ’-এর পরে ক, চ, ট, ত, প কিংবা খ, ছ, ঠ, থ, ফ থাকলে ‘দ/ধ’ এর জায়গায় ‘ত’ হয়।

দ’ ত	তদ+কাল = তৎকাল	হৃদ+কম্প = হৃৎকম্প	তদ+পর = তৎপর
	তদ+ত্ব = তত্ব		
ধ’ ত	ক্ষুধ+পিপাসা = ক্ষুৎপিপাসা		

৮. ঘোষ দন্ত্য ধ্বনি (দ/ধ) এর পরে ‘স’ (দন্ত্য স ধ্বনি) থাকলে ‘দ/ধ’ এর জায়গায় দন্ত্য অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি ‘ত’ হয়।  
অর্থাৎ, ‘দ/ধ’ এর পরে ‘স’ থাকলে ‘দ/ধ’ এর জায়গায় ‘ত’ হয়। যেমন-  
বিপদ+সংকুল = বিপৎসংকুল (‘দ’ এরপরে ‘স’ থাকায় ‘দ’, ‘ত’ হয়ে গেছে)  
তদ+সম = তৎসম

৯. ‘ষ’ (মূর্ধণ্য ষ ধ্বনি) এর পরে অঘোষ দন্ত্য ধ্বনি (ত, থ) থাকলে সেগুলো অঘোষ মূর্ধণ্য ধ্বনি (ট, ঠ) হয়ে যায়।  
অর্থাৎ, ‘ষ’ এর পরে ‘ত/থ’ থাকলে সেগুলো যথাক্রমে ‘ট/ঠ’ হয়ে যায়। যেমন-  
কৃষ+তি = কৃষ্টি (ষ+ত = ষ+ট)  
ষষ+থ = ষষ্ঠ (ষ+থ = ষ+ঠ)

১০. কিছু কিছু সন্ধি কিছু বিশেষ নিয়মে হয়। এগুলোকে বিশেষ নিয়মে সাধিত সন্ধি বলে।

বিশেষ নিয়মে সাধিত সন্ধি		
উৎ+স্থান = উত্থান	উৎ+স্থাপন = উত্থাপন	
পরি+কৃত = পরিকৃত	পরি+কার = পরিকার	
সম+কৃত = সংকৃত	সম+কৃতি = সংকৃতি	সম+কার = সংস্কার

মনে রাখার জন্য : উত্থান, উত্থাপন  
পরিকৃত, পরিকার  
সংকৃত, সংকৃতি, সংস্কার

১১. যে সকল ব্যঞ্জনসন্ধি কোনো নিয়ম না মেনে, বরং নিয়মের ব্যতিক্রম করে সন্ধি হয়, তাদেরকে নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি বলে। যেমন, ‘পতৎ+অঞ্জলি’, এখানে অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি ‘ত’ এর সঙ্গে স্বরধ্বনি ‘অ’ এর সন্ধি হয়েছে। সুতরাং, সন্ধির নিয়ম অনুসারে ‘ত’ এর জায়গায় ‘দ’ হওয়ার কথা। তার বদলে একটি ‘ত’ লোপ পেয়ে হয়েছে ‘পতঞ্জলি’। এরকম-

নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি
---------------------





আ+চর্য = আশ্চর্য	গো+পদ = গোষ্পদ
বন+পতি = বনস্পতি	বৃহৎ+পতি = বৃহস্পতি
তৎ+কর = তস্কর	পর+পর = পরস্পর
ষট্+দশ = ষোড়শ	এক+দশ = একাদশ
পতৎ+অঞ্জলি = পতঞ্জলি	মনস+ঈষা = মনীষা

মনে রাখার জন্য : আশ্চর্য, গোষ্পদ

বনস্পতি, বৃহস্পতি

তস্কর, পরস্পর

ষোড়শ, একাদশ

পতঞ্জলি, মনীষা

বিসর্গ সন্ধি

যে দুইটি ধ্বনির মিলনে সন্ধি হবে, তাদের একটি যদি বিসর্গ হয়, তবে তাকে বিসর্গ সন্ধি বলে। বিসর্গ সন্ধি ২ ভাবে সম্পাদিত হয়-

১. বিসর্গ + স্বরধ্বনি

২. বিসর্গ + ব্যঞ্জনধ্বনি

[বিসর্গসন্ধি ও ব্যঞ্জনসন্ধির সম্পর্ক : সংস্কৃত নিয়ম অনুযায়ী শব্দ বা পদের শেষে ‘র্’ বা ‘স্’ থাকলে তাদের বদলে ‘ঃ’ বা অঘোষ ‘হ’ উচ্চারিত হয়। এর উপর ভিত্তি করে বিসর্গকে ২ ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

**র-জাত বিসর্গ :** ‘র্’ ধ্বনির জায়গায় যে বিসর্গ হয়, তাকে র-জাত বিসর্গ বলে। যেমন : অন্তর- অন্তঃ, প্রাতর- প্রাতঃ, পুনর- পুনঃ, ইত্যাদি।

**স-জাত বিসর্গ :** ‘স্’ ধ্বনির জায়গায় যে বিসর্গ হয়, তাকে স-জাত বিসর্গ বলে। যেমন : নমস- নমঃ, পুরস- পুরঃ, শিরস- শিরঃ, ইত্যাদি।

মূলত, ‘ঃ’ হলো ‘র্’ ও ‘স্’ এর সংক্ষিপ্ত রূপ।

এই র-জাত বিসর্গ ও স-জাত বিসর্গ উভয়েই মূলত ব্যঞ্জনধ্বনিরই অন্তর্গত। এই কারণে অনেকে বিসর্গ সন্ধিকেও ব্যঞ্জনসন্ধিরই অন্তর্গত বলে মনে করে।]

বিসর্গ+স্বরধ্বনি

‘অ’ স্বরধ্বনির পরে ‘ঃ’ থাকলে এবং তারপরে আবার ‘অ’ থাকলে অ+ঃ+অ = ‘ও’ হয়। যেমন- ততঃ+অধিক = ততোধিক

বিসর্গ+ব্যঞ্জনধ্বনি

১. (ক) ‘অ’-এর পরে স-জাত ‘ঃ’, এবং তারপরে ঘোষ ধ্বনি, নাসিক্য ধ্বনি, অন্তস্থ ধ্বনি কিংবা হ থাকলে, ‘ঃ’-র জায়গায় ‘ও’ হয়।

অর্থাৎ, ‘অ’-এর পরে স-জাত ‘ঃ’, এবং তারপরে গ, জ, ড, দ, ব কিংবা ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ কিংবা ঙ, ঞ, ণ, ন, ম কিংবা য, র, ল, ব অথবা হ থাকলে আগের অ+ঃ=‘ও’ হয়।



/ExamKaDarrNahi



/info\_EKDN



8276808358

অর্থাৎ, ‘অ’-এর পরে স-জাত ‘ঃ’, এবং তারপরে বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চম ধ্বনি থাকলে কিংবা য, র, ল, ব, হ থাকলে আগের অ+ঃ=‘ও’ হয়। যেমন-

তিরঃ+ধান = তিরোধান (অ+ঃ+ধ)	মনঃ+রম = মনোরম (অ+ঃ+র)
তপঃ+বন = তপোবন (অ+ঃ+ব)	মনঃ+হর = মনোহর (অ+ঃ+হ)

(খ) ‘অ’-এর পরে র-জাত ‘ঃ’ থাকলে, এবং তারপরে স্বরধ্বনি কিংবা ঐ একই ধ্বনিগুলো থাকলে (ঘোষ ধ্বনি, নাসিক্য ধ্বনি, অন্তস্থ ধ্বনি ও হ), ‘ঃ’-র জায়গায় ‘র’ হয়। যেমন-

অন্তঃ+গত = অন্তর্গত (অ+ঃ+গ)	পুনঃ+আয় = পুনরায় (অ+ঃ+আ)
অন্তঃ+ধান = অন্তর্ধান (অ+ঃ+ধ)	পুনঃ+উক্ত = পুনরুক্ত (অ+ঃ+উ)
অন্তঃ+ভুক্ত = অন্তর্ভুক্ত (অ+ঃ+ভ)	পুনঃ+জন্ম = পুনর্জন্ম (অ+ঃ+জ)
অন্তঃ+বর্তী = অন্তর্বর্তী (অ+ঃ+ব)	পুনঃ+বার = পুনর্বার (অ+ঃ+ব)
অহঃ+অহ = অহরহ (অ+ঃ+অ)	পুনঃ+অপি = পুনরপি (অ+ঃ+অ)
	প্রাতঃ+উত্থান = প্রাতর্উত্থান (অ+ঃ+উ)

২. ‘অ/আ’ ছাড়া অন্য স্বরধ্বনির পরে ‘ঃ’ থাকলে এবং তারপরে অ, আ, ঘোষ ধ্বনি, নাসিক্য ধ্বনি, অন্তস্থ ধ্বনি কিংবা হ থাকলে ‘ঃ’-র জায়গায় ‘র’ হয়।

অর্থাৎ, ‘অ/আ’ ছাড়া অন্য স্বরধ্বনির পরে ‘ঃ’ থাকলে এবং তারপরে অ, আ কিংবা গ, জ, ড, দ, ব কিংবা ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ কিংবা ঙ, ঞ, ণ, ন, ম কিংবা য, র, ল, ব কিংবা হ থাকলে ‘ঃ’-র জায়গায় ‘র’ হয়।

অর্থাৎ, ‘অ/আ’ ছাড়া অন্য স্বরধ্বনির পরে ‘ঃ’ থাকলে এবং তারপরে অ, আ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ধ্বনি কিংবা য, র, ল, ব কিংবা হ থাকলে ‘ঃ’-র জায়গায় ‘র’ হয়। যেমন-

নিঃ+আকার = নিরাকার (ই+ঃ+আ)	দুঃ+যোগ = দুর্যোগ (উ+ঃ+য)
নিঃ+আকরণ = নিরাকরণ (ই+ঃ+আ)	দুঃ+লোভ = দুর্লোভ (উ+ঃ+ল)
নিঃ+জন = নির্জন (ই+ঃ+জ)	দুঃ+অন্ত = দুর্ন্ত (উ+ঃ+অ)
আশীঃ+বাদ = আশীর্বাদ (ঈ+ঃ+ব)	প্রাদুঃ+ভাব = প্রাদুর্ভাব (উ+ঃ+ভ)
জ্যোতিঃ+ময় = জ্যোতির্ময় (ই+ঃ+ম)	বহিঃ+গত = বহির্গত (ই+ঃ+গ)

**ব্যতিক্রম :** ‘ই/উ+ঃ+র’ হলে ‘ঃ’ লোপ পায় এবং ‘ঃ’-র আগের হ্রস্ব স্বরধ্বনি দীর্ঘ হয়। যেমন- ‘নিঃ+রব’, এখানে ‘ন+ই+ঃ’-এর ‘ই+ঃ’-এর পরে ‘র’ ধ্বনির সন্ধি হয়েছে। সুতরাং এখানে ‘ঃ’ লোপ পাবে এবং ‘ই’-র জায়গায় ‘ঈ’ হবে। অর্থাৎ সন্ধি হয়ে হবে ‘নিঃ+রব = নীরব’। এরকম- নিঃ+রস = নীরস।

৩. বিসর্গের পরে তালব্য অঘোষ ধ্বনি (চ, ছ) থাকলে বিসর্গের জায়গায় তালব্য শিশ (শ) ধ্বনি, বিসর্গের পরে মূর্ধণ্য অঘোষ ধ্বনি (ট, ঠ) থাকলে বিসর্গের জায়গায় মূর্ধণ্য শিশ (ষ) ধ্বনি, বিসর্গের পরে দন্ত্য অঘোষ ধ্বনি (ত, থ) থাকলে বিসর্গের জায়গায় দন্ত্য শিশ (স) ধ্বনি হয়। অর্থাৎ,

‘ঃ’-এর পরে ‘চ/ছ’ (তালব্য) থাকলে ‘ঃ’-এর জায়গায় ‘শ’



‘ঃ’-এর পরে ‘ট/ঠ’ (মূর্ধ্য) থাকলে ‘ঃ’-এর জায়গায় ‘ষ’

‘ঃ’-এর পরে ‘ত/থ’ (দন্ত্য) থাকলে ‘ঃ’-এর জায়গায় ‘স’ হয়। যেমন-ঃ

+চ/ছ = শ+চ/ছ	নিঃ+চয় = নিশ্চয়	শিরঃ+ছেদ = শিরশ্ছেদঃ	
+ট/ঠ = ষ+ট/ঠ	ধনুঃ+টঙ্কার = ধনুটঙ্কার	নিঃ+ঠুর = নিঠুরঃ	
+ত/থ = স+ত/থ	দুঃ+তর = দুস্তর	দুঃ+থ = দুস্থ	

৪. (ক) ‘অ/আ’ স্বরধ্বনির পরে ‘ঃ’ থাকলে এবং তারপরে অঘোষ কণ্ঠ্য বা ওষ্ঠ্য ধ্বনি (ক, খ, প, ফ) থাকলে ‘ঃ’-র জায়গায় অঘোষ দন্ত্য শিশ ধ্বনি (স) হয়।

অর্থাৎ, ‘অ/আ’-এর পরে ‘ঃ’ থাকলে এবং তারপরে ‘ক/খ/প/ফ’ থাকলে ‘ঃ’-র জায়গায় ‘স’ হয়।

(খ) ‘অ/আ’ ছাড়া অন্য কোন স্বরধ্বনির পরে ‘ঃ’ থাকলে এবং তারপরে অঘোষ কণ্ঠ্য বা ওষ্ঠ্য ধ্বনি (ক, খ, প, ফ) থাকলে ‘ঃ’-র জায়গায় অঘোষ মূর্ধ্য শিশ ধ্বনি (ষ) হয়।

অর্থাৎ, ‘অ/আ’-এর পরে ‘ঃ’ থাকলে এবং তারপরে ‘ক/খ/প/ফ’ থাকলে ‘ঃ’-র জায়গায় ‘ষ’ হয়।

যেমন-

(ক) অ/আ+ঃ+ক/খ/প/ফ		(খ) ই/ঈ/উ/ঊ/এ/ঐ/ও/ঔ +ঃ+ক/খ/প/ফ	
নমঃ+কার = নমস্কার	পদঃ+খলন = পদস্থলন	নিঃ+কার = নিষ্কার	দুঃ+কার = দুষ্কার
পুরঃ+কার = পুরস্কার		নিঃ+ফল = নিষ্ফল	দুঃ+প্রাপ্য = দুপ্রাপ্য
মনঃ+কামনা = মনস্কামনা	বাচঃ+পতি = বাচস্পতি	নিঃ+পাপ = নিষ্পাপ	দুঃ+কৃতি = দুষ্কৃতি
তিরঃ+কার = তিরস্কার		বহিঃ+কৃত = বহিষ্কৃত	চতুঃ+কোণ = চতুষ্কোণ
ভাঃ+কর = ভাস্কার		বহিঃ+কার = বহিষ্কার	চতুঃ+পদ = চতুষ্পদ
		আবিঃ+কার = আবিষ্কার	

৫. ‘ঃ’-র পরে স্ত, স্থ কিংবা স্প যুক্তব্যঞ্জনগুলো থাকলে পূর্ববর্তী ‘ঃ’ অবিকৃত থাকে কিংবা লোপ পায়। যেমন-

নিঃ+স্তর = নিঃস্তর/ নিস্তর

দুঃ+স্থ = দুঃস্থ/ দুস্থ

নিঃ+স্পন্দ = নিঃস্পন্দ/ নিস্পন্দ

৬. কিছু কিছু ক্ষেত্রে সন্ধির পরও ‘ঃ’ থেকে যায়। যেমন-

প্রাতঃ+কাল = প্রাতঃকাল

মনঃ+কষ্ট = মনঃকষ্ট

শিরঃ+পীড়া = শিরঃপীড়া

৭. কয়েকটি **বিশেষ বিসর্গ সন্ধি** (এগুলো গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু নিপাতনে সিদ্ধ বা বিশেষ নিয়মে সাধিত সন্ধি নয়। এগুলো কেবলই বিসর্গ সন্ধি)-

বিশেষ বিসর্গ সন্ধি	
বাচঃ+পতি = বাচস্পতি	অহঃ+নিশা = অহর্নিশ



ভাঃ+কর = ভাস্কর	অহঃ+অহ = অহরহ
-----------------	---------------

ভাষা অনুশীলন; ১ম পত্র

বাংলাদেশ

বিসর্গসন্ধি

বিসর্গযুক্ত ‘ই/উ’ ধ্বনির পরে ‘গ/দ’ থাকলে বিসর্গ স্থলে রেফ হয়। (আসলে গ/ঘ ও দ/ধ, ঘোষ ধ্বনি থাকলে) (নিয়ম ২; বিসর্গসন্ধি)

ই+ং+গ	নিঃ+গত = নিগত	
ই+ং+দ	নিঃ+দেশ = নির্দেশ	নিঃ+দোষ = নির্দোষ
উ+ং+গ	দুঃ+গত = দুর্গত	চতুঃ+গুণ = চতুর্গুণ
উ+ং+ঘ	দুঃ+ঘটনা = দুর্ঘটনা	
উ+ং+দ	চতুঃ+দিক = চতুর্দিক	

বিসর্গসন্ধি

দুঃ-উপসর্গের পরে ‘স’ থাকলে সন্ধিবদ্ধ শব্দে বিসর্গ বজায় থাকে। কিন্তু ‘ব’ বা ‘য’ থাকলে বিসর্গের বদলে রেফ হয়। (‘ব’ ঘোষ ধ্বনি এবং ‘য’ অন্তস্থ ধ্বনি বলে বিসর্গের বদলে রেফ হয়।) (নিয়ম ২; বিসর্গসন্ধি)

‘দুঃ+স’ থাকলে বিসর্গ থাকে		‘দুঃ+ব’ বা ‘দুঃ+য’ থাকলে বিসর্গ রেফ হয়ে যায়	
দুঃ+স		দুঃ+ব	দুঃ+য
দুঃ+সাহস = দুঃসাহস	দুঃ+সাধ্য = দুঃসাধ্য	দুঃ+বার = দুর্বার	দুঃ+যোগ = দুর্যোগ
দুঃ+সংবাদ = দুঃসংবাদ	দুঃ+সময় = দুঃসময়	দুঃ+বিনীত = দুর্বিনীত	
দুঃ+সহ = দুঃসহ		দুঃ+বিষহ = দুর্বিষহ	
		দুঃ+ব্যবহার = দুর্ব্যবহার	

## লিঙ্গ

ছেলে মেয়ের ধারণাকে বলা হয় লিঙ্গ। অর্থাৎ, পুংলিঙ্গ মানে পুরুষ, আর স্ত্রীলিঙ্গ মানে নারী বা মেয়ে বা স্ত্রী। এই বিভাজনই হলো লিঙ্গভেদ।

অন্যান্য ভাষার মতোই বাংলা ভাষাতেও লিঙ্গভেদে শব্দের রূপ পরিবর্তিত হয়। আবার অনেক সময় দুই লিঙ্গের দুইটি পৃথক শব্দও ব্যবহৃত হয়।

পুরুষবাচক শব্দ

যে শব্দ পুরুষ বা ছেলে বোঝায়, তাকে পুরুষবাচক শব্দ বলে। যেমন- বাপ, ভাই, ছেলে, ইত্যাদি।

স্ত্রীবাচক শব্দ

যে শব্দ নারী বা স্ত্রী বা মেয়ে বোঝায়, তাকে স্ত্রীবাচক শব্দ বলে। যেমন- মা, বোন, মেয়ে, ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, মূলত বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের লিঙ্গভেদ আছে। সংস্কৃত ভাষায় পুরুষবাচক বিশেষ্য পদের সঙ্গে পুরুষবাচক বিশেষণ পদ আর স্ত্রীবাচক বিশেষ্য পদের স্ত্রীবাচক বিশেষণ পদ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বাংলা ভাষায় এই নিয়ম মানা হয় না। বাংলা ভাষায় বিশেষণ পদের



/ExamKaDarrNahi



/info\_EKDN



8276808358

লিঙ্গভেদ করা হয় না। অর্থাৎ, বাংলা ভাষায় কেবল বিশেষ্য পদের লিঙ্গভেদ হয়। যেমন- সংস্কৃত ভাষায় ‘সুন্দর বালক ও সুন্দরী বালিকা’। কিন্তু বাংলা ভাষায় ‘সুন্দর বালক ও সুন্দর বালিকা’।

পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দগুলোকে সাধারণত ২টি ভাগে ভাগ করা যায়-

১. পতি ও পত্নীবাচক অর্থে পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ : আববা-আম্মা, বাবা-মা, চাচা-চাচি, কাকা-কাকি, জেঠা-জেঠি, দাদা-দাদি, নানা-নানি, নন্দাই-ননদ, দেওর-জা, ভাই-ভাবি/বৌদি, ইত্যাদি।

২. সাধারণ পুরুষ ও স্ত্রী জাতীয় অর্থে পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ : থোকা-খুকি, পাগল-পাগলি, বামন-বামনি, ভেড়া-ভেড়ী, মোরগ-মুরগি, বালক-বালিকা, দেওর-ননদ, ইত্যাদি।

পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দের গঠন

মূলত পুরুষবাচক শব্দের শেষে স্ত্রীবাচক প্রত্যয় যুক্ত হয়ে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠিত হয়। অর্থাৎ, পুরুষবাচক শব্দের শেষে একটি অতিরিক্ত শব্দাংশ যুক্ত হয়ে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠিত হয়। এই স্ত্রীবাচক প্রত্যয় ২ প্রকার- বাংলা স্ত্রী বাচক প্রত্যয় ও সংস্কৃত স্ত্রী বাচক প্রত্যয়। বাংলা স্ত্রী বাচক প্রত্যয়গুলো বাংলা শব্দের সঙ্গে আর সংস্কৃত স্ত্রী বাচক প্রত্যয়গুলো সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়।

শব্দের শেষে প্রত্যয় যুক্ত হওয়া ছাড়াও আরো কিছু বিশেষ নিয়মে পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচক শব্দ গঠিত হয়ে থাকে।

নিচে বাংলা ও সংস্কৃত শব্দের পুরুষ ও স্ত্রী বাচক শব্দের গঠন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

বাংলা শব্দের পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দের গঠন

বাংলা স্ত্রী প্রত্যয় যোগে পুরুষ হতে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠন :

১. ঈ-প্রত্যয় : বেঙ্গম-বেঙ্গমী, ভাগনা/ভাগনে- ভাগনী

২. নী-প্রত্যয় : কামার-কামারনী, জেলে-জেলেনী, কুমার-কুমারনী, ধোপা-ধোপানী, মজুর-মজুরনী

পুরুষবাচক শব্দের শেষে ‘ঈ’ থাকলে নী-প্রত্যয় যোগ হলে আগের ‘ঈ’, ‘ই’ হয়। যেমন- ভিখারী- ভিখারিনী

৩. আনী-প্রত্যয় : ঠাকুর-ঠাকুরানী, নাপিত-নাপিতানী, মেথর-মেথরানী, চাকর-চাকরানী

৪. ইনী-প্রত্যয় : কাঙাল-কাঙালিনী, গোয়ালা- গোয়ালিনী, বাঘ-বাঘিনী

৫. উন-প্রত্যয় : ঠাকুর-ঠাকুরন

৬. আইন-প্রত্যয় : (এরকম আরো নতুন নতুন প্রত্যয়ের প্রয়োগ দেখা যায়) ঠাকুর-ঠাকুরাইন

নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ

কতগুলো শব্দ নিত্য স্ত্রীবাচক। অর্থাৎ, এগুলো সর্বদাই স্ত্রীবাচক, এগুলোর কোন পুরুষবাচক শব্দই নেই। যেমন- সতীন, সৎমা, এয়ো, দাই, সখবা, ইত্যাদি।

শব্দের আগে পৃথক শব্দ যোগ করে :

কতগুলো শব্দের আগে পুরুষবাচক শব্দ গঠনের জন্য নর, মন্দা, ইত্যাদি ও স্ত্রীবাচক শব্দ গঠনের জন্য স্ত্রী, মাদী, মাদা, ইত্যাদি শব্দ যোগ করা হয়। যেমন- মর/ মন্দা/ হলো বিড়াল- মেনি বিড়াল, মন্দা হাঁস- মাদী হাঁস, মন্দা ঘোড়া- মাদী ঘোড়া, পুরুষলোক-মেয়েলোক, বেটাছেলে- মেয়েছেলে, পুরুষ কয়েদী- স্ত্রী/ মেয়ে কয়েদী, ঐঁড়ে বাছুর-বকনা বাছুর, বলদ গরু- গাই গরু

পুরুষবাচক শব্দের আগে স্ত্রীবাচক শব্দ প্রয়োগে :

কিছু কিছু পুরুষবাচক শব্দের আগে স্ত্রীবাচক শব্দ যোগ করে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠন করা হয়। যেমন- কবি- মহিলা কবি, ডাক্তার- মহিলা ডাক্তার, সভ্য- মহিলা সভ্য, কর্মী- মহিলা কর্মী, শিল্পী- মহিলা শিল্পী/ নারী শিল্পী, সৈন্য- নারী সৈন্য/ মহিলা সৈন্য, পুলিশ- মহিলা পুলিশ

শব্দের শেষে পৃথক শব্দ যোগ করে :

শব্দের শেষে পুরুষ বা স্ত্রীবাচক শব্দ যোগ করেও পুরুষ বা স্ত্রীবাচক শব্দ তৈরি করা যায়। যেমন- বোন-পো- বোন-ঝি, ঠাকুর-পো- ঠাকুর-ঝি, ঠাকুর দাদা/ ঠাকুরদা- ঠাকুরমা, গয়লা- গয়লা-বউ, জেলে- জেলে-বউ

ভিন্ন শব্দ প্রয়োগে :

দুটি ভিন্ন ভিন্ন শব্দের মাধ্যমে পুরুষ ও স্ত্রী বাচক বোঝানো যেতে পারে। যেমন- বাবা-মা, ভাই-বোন, কর্তা-গিন্নী, ছেলে-মেয়ে, সাহেব-বিবি, জামাই-মেয়ে, বর-কনে, দুলাহা-দুলাইন/ দুলাহিন, বেয়াই-বেয়াইন, তাঐ-মাঐ, বাদশা-বেগম, শুক-সারী

সংস্কৃত শব্দের পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দের গঠন

সংস্কৃত স্ত্রী প্রত্যয় যোগে পুরুষ হতে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠন :

১. আ-প্রত্যয় :



মৃত-মৃতা, বিবাহিত-বিবাহিতা, মাননীয়-মাননীয়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রিয়-প্রিয়া, প্রথম-প্রথমা, চতুর-চতুরা, চপল-চপলা, নবীন-নবীনা, কনিষ্ঠ-কনিষ্ঠা, মলিন-মলিনা, অজ-অজা, কোকিল-কোকিলা, শিষ্য-শিষ্যা, ক্ষত্রিয়-ক্ষত্রিয়া, শূদ্র-শূদ্রা

২. ঙ্গ-প্রত্যয় :

নিশাচর-নিশাচরী, ভয়ংকর-ভয়ংকরী, রজক-রজকী, কিশোর-কিশোরী, সুন্দর-সুন্দরী, চতুর্দশ-চতুর্দশী, ষোড়শ-ষোড়শী, সিংহ-সিংহী, ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী, মানব-মানবী, বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী, কুমার-কুমারী, ময়ূর-ময়ূরী

৩. ইকা-প্রত্যয় :

(ক) শব্দের শেষে অক থাকলে ইকা-প্রত্যয় যোগ হয় এবং অক'-র স্থলে ইকা হয়। যেমন- বালক-বালিকা, নায়ক-নায়িকা, গায়ক-গায়িকা, সেবক-সেবিকা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা।

ব্যতিক্রম : গণক-গণকী (গণিকা- বেশ্যা), নর্তক-নর্তকী, চাতক-চাতকী, রজক-রজকী/ রজকিনী (বাংলায়)

(খ) অনেক সময় ক্ষুদ্রার্থেও ইকা প্রত্যয় যোগ হয়। তখন সেটা আর স্ত্রী প্রত্যয় থাকে না, এগুলো ক্ষুদ্রার্থক প্রত্যয়। যেমন- নাটক-নাটিকা (ক্ষুদ্র নাটক, নাটকের স্ত্রী রূপ নয়), মালা-মালিকা (ক্ষুদ্র মালা), গীত-গীতিকা (ক্ষুদ্র গান), পুস্তক-পুস্তিকা (ক্ষুদ্র বই)।

৪. আনী-প্রত্যয় :

ইন্দ্র-ইন্দ্রানী, মাতুল-মাতুলানী, আচার্য-আচার্যানী (আচার্যের স্ত্রী, কিন্তু আচার্যের কাজে নিয়োজিত নারীও 'আচার্য'), শূদ্র-শূদ্রানী (শূদ্রের স্ত্রী, সাধারণ শূদ্র জাতীয় মহিলা 'শূদ্রা'), ক্ষত্রিয়-ক্ষত্রিয়ানী (ক্ষত্রিয়ের স্ত্রী, ক্ষত্রিয় জাতের মহিলা ক্ষত্রিয়া)

কখনো কখনো আনী-প্রত্যয় অর্থেরও পরিবর্তন ঘটায়। তখন সেটা আর স্ত্রী প্রত্যয় থাকে না। যেমন- অরণ্য-অরণ্যানী (বৃহৎ অরণ্য), হিম-হিমানী (জমানো বরফ)।

৫. নী, ঈনী-প্রত্যয় :

মায়াবী-মায়াবিনী, কুহক-কুহকিনী, যোগী-যোগিনী, মেধাবী-মেধাবিনী, দুঃখী-দুঃখিনী

**বিশেষ নিয়মে সাধিত স্ত্রীবাচক শব্দ**

১. যে সব পুরুষবাচক শব্দের শেষে 'তা' আছে, সেগুলোর শেষে 'ত্ৰী' হয়। যেমন- খাতা-খাত্ত্রী, নেতা-নেত্রী, কর্তা-কর্ত্রী, শ্রোতা-শ্রোত্রী

২. পুরুষবাচক শব্দের শেষে অত, বান, মান, ঈয়ান থাকলে স্ত্রীবাচক শব্দে যথাক্রমে অতী, বতী, মতী, ঈয়সী হয়। যেমন- সৎ-সতী, মহৎ-মহতী, গুণবান-গুণবতী, রূপবান-রূপবতী, শ্রীমান-শ্রীমতী, বুদ্ধিমান-বুদ্ধিমতী, গরীয়ান-গরীয়সী

৩. বিশেষ নিয়মে গঠিত স্ত্রীবাচক শব্দ : সম্রাট- সম্রাজ্ঞী, রাজা-রাণী, যুবক-যুবতী, শ্বশুর-শ্বশ্রু, নর-নারী, বন্ধু-বান্ধবী, দেবর- জা, শিক্ষক- শিক্ষয়িত্রী, স্বামী-স্ত্রী, পতি-পত্নী, সভাপতি-সভানেত্রী

নিত্য স্ত্রীবাচক তৎসম শব্দ

কতগুলো সংস্কৃত শব্দ নিত্য স্ত্রীবাচক। অর্থাৎ, এগুলো সর্বদাই স্ত্রীবাচক, এগুলোর কোন পুরুষবাচক শব্দই নেই। যেমন- সতীন, সৎমাতা, সধবা, কুলটা ইত্যাদি।

**বিদেশি পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ**

খান- খানম

মরদ- জেনানা

মালেক- মালেকা

মুহতারিম- মুহতারিমা

সুলতান- সুলতানা

দ্রষ্টব্য

১. কতোগুলো বাংলা শব্দ পুরুষ ও স্ত্রী দুই-ই বোঝায়। যেমন- জন, পাখি, শিশু, সন্তান, শিক্ষিত, গুরু

২. কতোগুলো শব্দ শুধু পুরুষ বোঝায়। যেমন- কবিরাজ, ঢাকী, কৃতদার, অকৃতদার

৩. কতোগুলো শব্দ শুধু স্ত্রীবাচক হয়। যেমন- সতীন, সৎমা, সধবা

৪. কিছু পুরুষবাচক শব্দের দুটো করে স্ত্রীবাচক শব্দ আছে-

দেবর- ননদ (দেবরের বোন), জা (দেবরের স্ত্রী)

ভাই- বোন, ভাবি/ বৌদি (ভাইয়ের স্ত্রী)





শিক্ষক- শিক্ষয়িত্রী (নারী শিক্ষক), শিক্ষকপত্নী (শিক্ষকের স্ত্রী)

বন্ধু- বান্ধবী মেয়ে বন্ধু), বন্ধুপত্নী (বন্ধুর স্ত্রী)

দাদা-দিদি (বড় বোন), বৌদি (দাদার স্ত্রী)

৫. বাংলা স্ত্রীবাচক শব্দের বিশেষণ স্ত্রীবাচক হয় না। যেমন- সুন্দর বলদ- সুন্দর গাই, সুন্দর ছেলে- সুন্দর মেয়ে, মেজ খুড়ো- মেজ খুড়ি

৬. বাংলায় বিশেষণ পদের স্ত্রীবাচক হয় না। যেমন- মেয়েটি পাগল হয়ে গেছে (পাগলি হবে না)। নদী ভয়ে অস্থির হয়ে গেছে (অস্থিরা হবে না)।

৭. কুল-উপাধি-বংশ ইত্যাদিরও স্ত্রীবাচক রূপ আছে। যেমন- ঘোষ- ঘোষজা (কন্যা অর্থে), ঘোষজায়া (পত্নী অর্থে)

## বচন

বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের সংখ্যার ধারণা প্রকাশের উপায় বা সংখ্যাঅনুক্রম প্রকাশের উপায়কে বচন বলে। অর্থাৎ বিশেষ্য বা সর্বনাম পদ যে ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীর প্রতিনিধিত্ব করছে বা বোঝাচ্ছে, সেই ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীর সংখ্যা, অর্থাৎ সেটি একসংখ্যক না একাধিক সংখ্যাক, তা বোঝানোর পদ্ধতিকেই বচন বলে।

প্রকারভেদ

বচন ২ প্রকার- একবচন ও বহুবচন।

একবচন

যখন কোন শব্দ দ্বারা কেবল একটি ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীকে বোঝান হয়, তখন তাকে একবচন বলে। যেমন- ছেলেটা, গরচটা, কলমটা, ইত্যাদি।

বহুবচন

যখন কোন শব্দ দ্বারা একাধিক ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীকে বোঝান হয়, তখন তাকে বহুবচন বলে। যেমন- ছেলেগুলো, গরচগুলো, কলমগুলি, ইত্যাদি।

কেবল বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের বচনভেদ হয়। কখনোই বিশেষণ পদের বচনভেদ হয় না। কিন্তু কোন বিশেষণবাচক শব্দ যদি কোন বাক্যে বিশেষ্য পদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তখন তা বিশেষ্য পদ হয়, এবং কেবল তখনই তার বচনভেদ হয়। [পদ প্রকরণ]

বাংলায় বহুবচন বোঝানোর জন্য কতগুলো শব্দ বা শব্দাংশ (বিভক্তি) ব্যবহৃত হয়। এগুলোর অধিকাংশই এসেছে সংস্কৃত ভাষা থেকে। অর্থাৎ, বলা যায়, এগুলোর বেশিরভাগই তৎসম শব্দ বা শব্দাংশ। যেমন- রা, এরা, গুলা, গুলি, গুলো, দিগ, দের (শব্দাংশ বা বিভক্তি); সব, সকল, সমুদয়, কুল, বৃন্দ, বর্গ, নিচয়, রাজি, রাশি, পাল, দাম, নিকর, মালা, আবলি (শব্দ)।

বহুবচন বোধক শব্দাংশের ব্যবহার

১. রা/এরা: শুধু উন্নত প্রাণীবাচক শব্দের সঙ্গে, অর্থাৎ মানুষ বা মনুষ্যবাচক শব্দের সঙ্গে ‘রা/এরা’ ব্যবহৃত হয়। সোজা কথায়, বস্তুবাচক শব্দের সঙ্গে ‘রা/এরা’ যুক্ত হয়। যেমন- ছাত্ররা লেখাপড়া করে। শিক্ষকেরা লেখাপড়া করান। তারা সবাই লেখাপড়া করতে ভালোবাসে।

২. গুলা/গুলি/গুলো: বস্তু ও প্রাণীবাচক শব্দের সঙ্গে ‘গুলো/গুলি/গুলো’ যুক্ত হয়। যেমন- বানরগুলো দাঁত কেলাচ্ছে। অতগুলো আম কে খাবে? গুলিগুলো মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছিলো।

বহুবচন বোধক শব্দের ব্যবহার

১. উন্নত প্রাণীবাচক বা ব্যক্তিবাচক শব্দের সঙ্গে ব্যবহৃত বহুবচন বোধক শব্দ-

- গণ- দেবগণ, নরগণ, জনগণ
- বৃন্দ- সুধীবৃন্দ, ভক্তবৃন্দ, শিক্ষকবৃন্দ,
- মন্ডলী- শিক্ষকমন্ডলী, সম্পাদকমন্ডলী



/ExamKaDarrNahi



/info\_EKDN



8276808358

- বর্গ- পণ্ডিত বর্গ, মন্ত্রী বর্গ

২. বস্তু ও প্রাণীবাচক শব্দের সঙ্গে ব্যবহৃত বহুবচন বোধক শব্দ-

- কুল- পক্ষিকুল, বৃক্ষকুল, (ব্যতিক্রম- কবিকুল, মাতৃকুল)
- সকল- পর্বতসকল, মনুষ্যসকল
- সব- ভাইসব, পাখিসব
- সমূহ- বৃক্ষসমূহ, মনুষ্যসমূহ

৩. কেবল জন্তুবাচক শব্দের সঙ্গে ব্যবহৃত বহুবচন বোধক শব্দ-

- পাল- গরুর পাল
- যুথ- পশুযুথ

৪. বস্তুবাচক বা অপ্রাণীবাচক শব্দের সঙ্গে ব্যবহৃত বহুবচন বোধক শব্দ-

- আবলি- পুষ্টকাবলি
- গুচ্ছ- কবিতাগুচ্ছ
- দাম- কুসুমদাম
- নিকর- কমলনিকর
- পুঞ্জ- মেঘপুঞ্জ
- মালা- পর্বতমালা
- রাজি- তারকারাজি
- রাশি- বালিরাশি
- নিচয়- কুসুমনিচয়

বহুবচনের বিশেষ প্রয়োগ

১. একবচন বোধক বিশেষ্য ব্যবহার করেও বহুবচন বোঝানো যেতে পারে। যেমন-

- সিংহ বনে থাকে। (সব সিংহ বনে থাকে বোঝাচ্ছে।)
- পোকাকার আক্রমণে ফসল নষ্ট হয়। (অনেক পোকাকার আক্রমণ বোঝাচ্ছে।)
- বাজারে লোক জমেছে। (অনেক লোক জমেছে বোঝাচ্ছে।)
- বাগানে ফুল ফুটেছে। (অনেক ফুল ফুটেছে বোঝাচ্ছে।)

২. একবচন বোধক বিশেষ্যের আগে বহুবচন বোধক শব্দ, যেমন- অজস্র, অনেক, বিস্তর, বহু, নানা, ঢের ব্যবহার করেও বহুবচন বোঝানো যেতে পারে। যেমন-

- অজস্র লোক, অনেক ছাত্র, বিস্তর টাকা, বহু মেহমান, নানা কথা, ঢের খরচ, অঢেল টাকা, ইত্যাদি।

৩. বিশেষ্য পদ বা তার সম্পর্কে বর্ণনাকারী বিশেষণ পদের দ্বিত্ব প্রয়োগে, অর্থাৎ পদটি পরপর দুইবার ব্যবহার করেও বহুবচন বোঝানো যেতে পারে। যেমন-

- হাঁড়ি হাঁড়ি সন্দেশ, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা, লাল লাল ফুল, বড় বড় মাঠ।

৪. বিশেষ নিয়মে সাধিত বহুবচন-

- মেয়েরা কানাকানি করছে। ('মেয়েরা' বলতে এখানে নির্দিষ্ট কিছু মেয়েদের বোঝাচ্ছে, যারা কানাকানি করছে।)
- এটাই করিমদের বাড়ি। ('করিমদের' বলতে এখানে করিমের পরিবারকে বোঝানো হচ্ছে।)
- রবীন্দ্রনাথরা প্রতিদিন জন্মায় না। ('রবীন্দ্রনাথরা' বলতে রবীন্দ্রনাথের মতো সাহিত্যিকদের বোঝানো হচ্ছে।)
- সকলে সব জানে না।

৫. কিছু বিদেশি শব্দে বাংলা ভাষার বহুবচনের পদ্ধতির পাশাপাশি বিদেশি ভাষার অনুকরণেও বহুবচন করা হয়ে থাকে। যেমন-

- বুজুর্গ- বুজুর্গাইন
- সাহেব- সাহেবান

বিশেষ দ্রষ্টব্য : বহুবচন বোধক শব্দ ও শব্দাংশগুলোর অধিকাংশই সংস্কৃত। আর তাই এগুলো ব্যবহারের নিয়মও সংস্কৃত শব্দ বা তৎসম শব্দেই বেশি হয়। খাঁটি বাংলা শব্দ বা তদ্ভব শব্দে এসব নিয়ম সাধারণত মানা হয় না। আর আধুনিক বাংলা ভাষার চলিত রীতিতেও এ সকল নিয়ম প্রায়ই মানা হয় না। তদ্ভব শব্দের বহুবচনে ও আধুনিক চলিত রীতিতে বিশেষ্য ও সর্বনামের চলিত রীতিতে সহজ কয়েকটি



শব্দ ও শব্দাংশ ব্যবহৃত হয়। এগুলো হল-

- শব্দাংশ- রা, এরা, গুলা, গুলো, দের
- শব্দ- অনেক, বহু, সব

সাবধানতা/ অশুদ্ধি সংশোধন

একই সঙ্গে একাধিক/ একটির বেশি বহুবচন বোধক শব্দ ও শব্দাংশ ব্যবহার করা যাবে না। যেমন- ‘সব মানুষেরা’ বললে তা ভুল হবে। বলতে হবে ‘সব মানুষ’ বা ‘মানুষেরা’।

## ক্রিয়া পদ

যে পদ দিয়ে কোন কাজ করা বোঝায়, তাকে ক্রিয়া পদ বলে।

অর্থাৎ, বাক্যের অন্তর্গত যে পদ দ্বারা কোন কাজ সম্পাদন করা বা কোন কাজ সংঘটন হওয়াকে বোঝায়, তাকে ক্রিয়া পদ বলে।

ক্রিয়ামূল বা ধাতুর সঙ্গে পুরুষ ও কাল অনুযায়ী ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত হয়ে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। যেমন, ‘পড়’ একটি ধাতু। এর সঙ্গে উত্তম পুরুষ ও সাধারণ বর্তমান কাল অনুযায়ী ‘ই’ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে গঠিত হয় ‘পড়ি’ ক্রিয়াপদটি। আবার মধ্যম পুরুষের জন্য হবে ‘পড়ো’। নাম পুরুষের জন্য হবে ‘পড়ে’। আবার উত্তম পুরুষের জন্য ঘটমান বর্তমান কালের জন্য হবে ‘পড়ছি’। সাধারণ অতীত কালের জন্য হবে ‘পড়েছি’।

ক্রিয়ার প্রকারভেদ

### ১. সমাপিকা-অসমাপিকা ক্রিয়া

বাক্যের ভাব প্রকাশের উপর ভিত্তি করে ক্রিয়াপদকে সমাপিকা ক্রিয়া ও অসমাপিকা ক্রিয়া, এই দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে।

**সমাপিকা ক্রিয়া :** যে ক্রিয়া পদ বাক্যের ভাবের পরিসমাপ্তি ঘটায়, তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে। অর্থাৎ, যে ক্রিয়া পদ বাক্যকে সম্পূর্ণ করে, আর কিছু শোনার আকাঙ্ক্ষা বাকি থাকে না, তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে।

একটি বাক্যে একটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকতেই হয়। এবং একটি বাক্যে একটার বেশি সমাপিকা ক্রিয়া থাকতে পারে না। যেমন-

- ছেলেরা খেলছে। ছেলেরা খেলা করছে।

দ্বিতীয় বাক্যে ‘খেলা’ সমাপিকা ক্রিয়া নয়। এ জন্য ‘করছে’ সমাপিকা ক্রিয়া আনতে হয়েছে। নয়তো বাক্যটি সম্পূর্ণ হচ্ছে না।

**অসমাপিকা ক্রিয়া :** যে ক্রিয়া পদ দ্বারা বাক্যের ভাবের পরিসমাপ্তি ঘটে না, তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। অর্থাৎ, যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্য সম্পূর্ণ হয় না, আরো কিছু শোনার আকাঙ্ক্ষা থেকেই যায়, তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে।

অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহারের পরও বাক্যে সমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহার করতে হয়। শুধু অসমাপিকা ক্রিয়া দিয়ে বাক্য গঠিত হয় না।

একটি বাক্যে যতোগুলো ইচ্ছা অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহার করা যায়। কিন্তু একটি সমাপিকা ক্রিয়া আনতেই হয়। যেমন-

- ছেলেরা খেলা।

এখানে খেলা একটি অসমাপিকা ক্রিয়া। ক্রিয়া পদ হলেও এটি দিয়ে বাক্যটি সম্পূর্ণ হয়নি, আরো কিছু শোনার আকাঙ্ক্ষা থেকেই যাচ্ছে। এর সঙ্গে আরেকটি সমাপিকা ক্রিয়া ‘করছে’ যোগ করলেই কেবল বাক্যটি সম্পূর্ণ হবে।

- ছেলেরা খেলা করছে।

সাধারণত অসমাপিকা ক্রিয়ার শেষে ইয়া, ইলে, ইতে, এ, লে, তে বিভক্তিগুলো যুক্ত থাকে।

### ২. সক্রমক-অক্রমক-দ্বিক্রমক ক্রিয়া

বাক্যে ক্রিয়ার কর্মের উপর ভিত্তি করে ক্রিয়াপদকে অক্রমক, সক্রমক ও দ্বিক্রমক- এই ৩ ভাগে ভাগ করা হয়।

**কর্ম পদ :** যে পদকে আশ্রয় করে ক্রিয়া পদ তার কাজ সম্পাদন বা সংঘটন করে, তাকে কর্ম পদ বলে। অর্থাৎ, ক্রিয়া পদ কাজ করার জন্য যেই পদকে ব্যবহার করে, তাকে কর্ম পদ বলে।

ক্রিয়া পদকে ‘কী/ কাকে’ দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায়, সেটিই কর্মপদ। আর যদি উত্তর না পাওয়া যায়, তবে সেই ক্রিয়ার কোন কর্মপদ নেই। যেমন-

- মেয়েটি কলম কিনেছে।
- মেয়েটি হাসে।

এখানে প্রথম বাক্যে ক্রিয়াপদ ‘কিনেছে’কে ‘কী’ দিয়ে প্রশ্ন করলে উত্তর পাওয়া যায় ‘কলম’। (কী কিনেছে? - কলম) অর্থাৎ, প্রথম



বাক্যের ক্রিয়ার কর্মপদ কলম।

আবার দ্বিতীয় বাক্যের ক্রিয়াপদ ‘হাসে’কে ‘কী/ কাকে’ কোনটা দিয়ে প্রশ্ন করলেই কোন উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না। সুতরাং, এই বাক্যের ক্রিয়াপদের কোন কর্ম নেই।

**অকর্মক ক্রিয়া :** যে ক্রিয়াপদের কোন কর্ম নেই তাকে অকর্মক ক্রিয়া বলে।

**সকর্মক ক্রিয়া :** যে ক্রিয়াপদের কর্ম পদ আছে তাকে সকর্মক ক্রিয়া বলে।

**দ্বিকর্মক ক্রিয়া :** কখনো কখনো একটি বাক্যে একই ক্রিয়াপদের দুটি কর্ম পদ থাকে। তখন সেই ক্রিয়াপদকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে। এক্ষেত্রে, **বস্তুরাচক কর্মপদকে প্রধান বা মুখ্য কর্ম বলে এবং ব্যক্তিব্যচক কর্মপদকে গৌণ কর্ম বলে।** অর্থাৎ, বস্তুরাচক কর্মটিকেই বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। যেমন- ‘বাবা আমাকে একটি ল্যাপটপ কিনে দিয়েছেন।’

এখানে ‘কিনে দিয়েছেন’ ক্রিয়ার কর্মপদ দুটি, ‘আমাকে’ (কাকে কিনে দিয়েছেন?) ও ‘ল্যাপটপ’ (কী কিনে দিয়েছেন?)। এখানে বস্তুরাচক কর্মপদ ‘ল্যাপটপ’, আর ব্যক্তিব্যচক কর্মপদ ‘আমাকে’। সুতরাং এখানে মুখ্য বা প্রধান কর্মপদ ‘ল্যাপটপ’ আর গৌণ বা অপ্রধান কর্ম ‘আমাকে’।

**সমধাতুজ কর্ম :** বাক্যের ক্রিয়াপদ ও কর্মপদ যদি একই ধাতু বা ক্রিয়ামূল থেকে গঠিত হয়, তবে তাকে সমধাতুজ কর্মপদ বলে। অর্থাৎ, ক্রিয়াপদ ও কর্মপদ একই শব্দমূল থেকে গঠিত হলে তাকে সমধাতুজ কর্মপদ বলে। যেমন-

- আজ এমন ঘুম ঘুমিয়েছি।

এখানে ক্রিয়াপদ ‘ঘুমিয়েছি’, আর কর্মপদ ‘ঘুম’ (কী ঘুমিয়েছি?)। আর এই ‘ঘুমিয়েছি’ আর ‘ঘুম’ দুটি শব্দেরই শব্দমূল ‘ঘুম্’। অর্থাৎ, শব্দ দুইটি একই ধাতু হতে গঠিত (ক্রিয়ার মূলকে ধাতু বলে)। সুতরাং, এই বাক্যে ‘ঘুম’ কর্মটি একটি সমধাতুজ কর্ম। এরকম-

- আজ কী খেলা খেললাম। (খেল্)
- আর মায়াকান্না কেঁদো না। (কাঁদ)
- এমন মরণ মরে কয়জনা? (মর্)

### ৩. প্রয়োজক ক্রিয়া

যে ক্রিয়া একজনের প্রয়োজনায় আরেকজন করে তাকে প্রয়োজক ক্রিয়া বলে।

প্রয়োজক ক্রিয়ার দু’জন কর্তা থাকে। এর মধ্যে একজন কর্তা কাজটি আরেকজন কর্তাকে দিয়ে করান। অর্থাৎ, একজন যখন আরেকজনকে দিয়ে কোন কাজ করিয়ে নেয়, তখন সেই ক্রিয়াপদটিকে বলে প্রয়োজক ক্রিয়া। [সংস্কৃত ব্যাকরণে এরই নাম গিজন্ত ক্রিয়া।]

প্রয়োজক ক্রিয়ার দুইজন কর্তার মধ্যে যিনি কাজটি করান, তাকে বলে প্রয়োজক কর্তা। আর যিনি কাজটি করেন, তাকে বলে প্রয়োজ্য কর্তা। তাকে দিয়ে কাজটি প্রয়োজ্য করা হয় বলে তাকে প্রয়োজ্য কর্তা বলে। যেমন-

- মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন।

এখানে চাঁদ দেখার কাজটি করছে ‘শিশু’, কিন্তু চাঁদ দেখাচ্ছেন ‘মা’। অর্থাৎ, ‘মা’ কাজটি প্রয়োজনা করছেন। তাই ‘মা’ এখানে প্রয়োজক কর্তা। আর চাঁদ দেখার কাজটি আসলে ‘শিশু’ করছে, তাই ‘শিশু’ এখানে প্রয়োজ্য কর্তা। এরকম-

- সাপুড়ে সাপ খেলায়। (এখানে সাপুড়ে প্রয়োজক কর্তা, আর সাপ প্রয়োজ্য কর্তা)

### ৪. নামধাতুর ক্রিয়া

বিশেষ্য, বিশেষণ ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের পরে ‘আ’ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে যে সব ধাতু গঠিত হয়, তাদেরকে নামধাতু বলে। নামধাতুর সঙ্গে ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত হয়ে যেসব ক্রিয়াপদ গঠন করে, তাদেরকেই নামধাতুর ক্রিয়া বলে।

যেমন-

- বিশেষ্য = বেত+আ = বেতা, ক্রিয়াপদ = বেতানো, বেতাচ্ছেন, বেতিয়ে
- বিশেষণ = বাঁকা+আ = বাঁকা, ক্রিয়াপদ = বাঁকানো, বাঁকাচ্ছেন, বাঁকিয়ে
- ধ্বন্যাত্মক অব্যয় = কন কন+আ = কনকনা, ক্রিয়াপদ = কনকনাচ্ছে, কনকনিয়ে

বাক্যে প্রয়োগ- লোকটি ছেলেটিকে বেতাচ্ছে।

- কঞ্চিটি বাঁকিয়ে ধর।
- দাঁত ব্যথায় কনকনাচ্ছে। অজগরটি ফোঁসাচ্ছে।



ব্যতিক্রম : কয়েকটি নামধাতু ‘আ’ প্রত্যয় ছাড়াই ধাতু হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন-

- ফল = বাগানে এবার অনেক আম ফলেছে।
- টক = তরকারি বাসি হলে টকে।
- ছাপা = প্রকাশক তার বইটা এবার মেলায় ছেপেছে।

#### ৫. যৌগিক ক্রিয়া

একটি সমাপিকা ক্রিয়া ও একটি অসমাপিকা ক্রিয়া পাশাপাশি বসে যদি কোন বিশেষ বা সম্প্রসারিত অর্থ প্রকাশ করে, তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে। অর্থাৎ, একটি সমাপিকা ও একটি অসমাপিকা ক্রিয়া মিলে যদি তাদের সাধারণ অর্থ প্রকাশ না করে কোন বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে, তখন তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে। যেমন-

- ঘটনাটা শুনে রাখ। (শোনার বদলে তাগিদ দেয়া অর্থ বুঝিয়েছে)
- তিনি বলতে লাগলেন। (বলার অর্থ সম্প্রসারণ করে নিরন্তর বলা বুঝিয়েছে)
- ছেলেমেয়েরা শুয়ে পড়ল। (শোওয়ার পাশাপাশি দিনের কার্যসমাপ্তিও বোঝাচ্ছে)
- সাইরেন বেজে উঠল। (আকস্মিক সাইরেন বাজার কথা বলা হচ্ছে)
- শিক্ষায় মন সংস্কারমুক্ত হয়ে থাকে। (অভ্যন্তরীণ অর্থে, ধীরে ধীরে সংস্কারমুক্ত হয় বোঝাচ্ছে)
- এখন যেতে পার। (যাওয়ার বদলে অনুমোদন অর্থে)

#### ৬. মিশ্র ক্রিয়া

বিশেষ্য, বিশেষণ ও ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের সঙ্গে কর্, হ্, দে, পা, যা, কাট্, গা, ছাড়্, ধর, মার, প্রভৃতি ধাতু যোগ হয়ে ক্রিয়াপদ গঠন করে কোন বিশেষ অর্থ প্রকাশ করলে তাকে মিশ্র ক্রিয়া বলে। যেমন-

বিশেষ্যের পরে :

- আমরা তাজমহল দর্শন করলাম।
- গোল্লায় যাও।

বিশেষণের পরে :

- তোমাকে দেখে বিশেষ প্রীত হলাম।

ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের পরে :

- মাথা ঝিম ঝিম করছে। ঝম ঝম করে বৃষ্টি পড়ছে।

[খেয়াল রাখতে হবে, যৌগিক ক্রিয়া দুইটি ক্রিয়ার মাধ্যমে গঠিত হয়, যার একটি সমাপিকা ক্রিয়া আরেকটি অসমাপিকা ক্রিয়া। অন্যদিকে, মিশ্র ক্রিয়া বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের পরে ক্রিয়াপদ বসে গঠিত হয়।]

#### পুরুষভেদে ক্রিয়ার রূপ

পুরুষ	সাধারণ	সম্ভ্রমাত্মক	তুচ্ছার্থক/ ঘনিষ্ঠার্থক
উত্তম পুরুষ	আমি যাই আমরা যাই	_____	_____
মধ্যম পুরুষ	তুমি যাও তোমরা যাও	আপনি যান আপনারা যান	তুই যা তোরা যা
নাম পুরুষ	সে যায় তারা যায়	তিনি যান তারা যান	এটা যায় এগুলো যায়

[উত্তম পুরুষ : বাক্যের বক্তাই উত্তম পুরুষ। অর্থাৎ, যেই ব্যক্তি বাক্যটি বলেছে, সেই উত্তম পুরুষ। উত্তম পুরুষের সর্বনামের রূপ হলো- আমি, আমরা, আমাকে, আমাদের, ইত্যাদি।

মধ্যম পুরুষ : বাক্যের উদ্দিষ্ট শ্রোতাই মধ্যম পুরুষ। অর্থাৎ, উত্তম পুরুষ যাকে উদ্দেশ্য করে বাক্যটি বলে, এবং পাশাপাশি বাক্যেও উল্লেখ করে, তাকে মধ্যম পুরুষ বলে। অর্থাৎ, প্রত্যক্ষভাবে উদ্দিষ্ট শ্রোতাই মধ্যম পুরুষ। মধ্যম পুরুষের সর্বনামের রূপ হলো- তুমি, তোমরা,



তোমাকে, তোমাদের, তোমাদিগকে, আপনি, আপনার, আপনাদের, ইত্যাদি।

নামপুরুষ : বাক্যে বক্তা অনুপস্থিত যেসব ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীর উল্লেখ করেন, তাদের নামপুরুষ বলে। অর্থাৎ, বক্তার সামনে নেই এমন যা কিছু কথ্য বক্তা বাক্যে বলেন, সবগুলোই নামপুরুষ। নাম পুরুষের সর্বনামের রূপ হলো- সে, তারা, তাহারা, তাদের, তাহাকে, তিনি, তাঁকে, তাঁরা, তাঁদের, ইত্যাদি।]

## সমার্থক শব্দ

যে সব শব্দ একই অর্থ প্রকাশ করে, তাদের সমার্থক শব্দ বা একার্থক শব্দ বলে।

মূলত, রচনায় মাধুর্য সৃষ্টি বা রক্ষার জন্য রচনার বিভিন্ন জায়গায় একই অর্থবোধক একটি শব্দ ব্যবহার না করে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়। বিশেষত কবিতায় এবং কাব্যধর্মী গদ্যরচনায় এর প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশি।

গুরুত্বপূর্ণ শব্দ : রাত্রি, কপাল, গরু, লাল, পদ্ম, কোকিল, সাগর, নদী, ঘোড়া, সূর্য, চাঁদ, আলো, ঘর, বায়ু, পানি, পর্বত, পৃথিবী, বিদ্যুত, মেয়ে/স্ত্রী/কন্যা, মেঘ অগ্নি, হাতি, কপাল, সাহসী, নারী, সুগন্ধ্য,

কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমার্থক শব্দ

অগ্নি অনল, পাবক, আগুন, দহন, সর্বভুক, শিখা, হুতাশন, বহ্নি, বৈশ্বানর, কৃশানু, বিভাবসু, সর্বশুচি

অন্ধকার আঁধার, তমঃ, তমিশ্রা, তিমির, আন্ধার, তমস্র, তম

অতনু মদন, অনঙ্গ, কাম, কন্দর্প

আকাশ আসমান, অম্বর, গগন, নভোঃ, নভোমণ্ডল, খগ, ব্যোম, অন্তরীক্ষ

আলোক আলো, জ্যোতি, কিরণ, দীপ্তি, প্রভা

ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা, অভিলাষ, অভিরুচি, অভিপ্রায়, আগ্রহ, স্পৃহা, কামনা, বাসনা, বাঞ্চা, ঈশ্বা, ঈহা

কপাল ললাট, ভাল, ভাগ্য, অদৃষ্ট, নিয়তি, অলিক

কোকিল পরভূত, পিক, বসন্তদূত

কন্যা মেয়ে, দুহিতা, দুলালী, আত্মজা, নন্দিনী, পুত্রী, সূতা, তনয়া

গরু গো, গাভী, ধেনু

ঘোড়া অশ্ব, ঘোটক, তুরগ, বাজি, হয়, তুরঙ্গ, তুরঙ্গম

ঘর গৃহ, আলয়, নিবাস, আবাস, আশ্রয়, নিলয়, নিকেতন, ভবন, সদন, বাড়ি, বাটী, বাসস্থান

চক্ষু চোখ, আঁখি, অক্ষি, লোচন, নেত্র, নয়ন, দর্শনেন্দ্রিয়

চন্দ্র চাঁদ, চন্দ্রমা, শশী, শশধর, শশাঙ্ক, শুধাংশু, হিমাংশু, সুধাকর, সুধাংশু, হিমাংশু, সোম, বিধু, ইন্দু, নিশাকর, নিশাকান্ত, মৃগাঙ্ক, রজনীকান্ত

চুল চিকুর, কুন্তল, কেশ, অলক,

জননী মা, মাতা, প্রসূতি, গর্ভধারিণী, জন্মদাত্রী,

দিন দিবা, দিবস, দিনমান

দেবতা অমর, দেব, সুর, ত্রিদশ, অমর, অজর, ঠাকুর

দ্বন্দ্ব বিরোধ, ঝগড়া, কলহ, বিবাদ, যুদ্ধ

তীর কূল, তট, পাড়, সৈকত, পুলিন, ধার, কিনারা





নারী	রমণী, কামিনী, মহিলা, স্ত্রী, অবলা, স্ত্রীলোক, অঙ্গনা, ভাসিনী, ললনা, কান্তা, পত্নী, সীমন্তনী
নদী	তটিনী, তরঙ্গিনী, প্রবাহিনী, শৈবালিনী, স্রোতস্বতী, স্রোতস্বিনী, গাঙ, স্বরিং, নিবারণিনী, কল্লোলিনী
নৌকা	নাও, তরণী, জলযান, তরী
পণ্ডিত	বিদ্বান, জ্ঞানী, বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ
পদ্ম	কমল, উৎপল, সরোজ, পঙ্কজ, নলিন, শতদল, রাজীব, কোকনদ, কুবলয়, পুণ্ডরীক, অরবিন্দ, ইন্দীবর, পুষ্প, তামরস, মৃণাল, সরসিজ, কুমুদ
পৃথিবী	ধরা, ধরিত্রী, ধরণী, অবনী, মেদিনী, পৃ, পৃথ্বী, ভূ, বসুধা, বসুন্ধরা, জাহান, জগৎ, দুনিয়া, ভূবন, বিশ্ব, ভূ-মণ্ডল
পর্বত	শৈল, গিরি, পাহাড়, অচল, অটল, অদ্রি, চূড়া, ভূধর, নগ, শৃঙ্গী, শৃঙ্গধর, মহীধর, মহীন্দ্র
পানি	জল, বারি, সলিল, উদক, অম্বু, নীর, পয়ঃ, তোয়, অপ, জীবন, পানীয়
পুত্র	তনয়, সুত, আত্মজ, ছেলে, নন্দন
পত্নী	জায়া, ভার্যা, ভামিনী, স্ত্রী, অর্ধাঙ্গী, সহধর্মিণী, জীবন সাথী, বউ, দারা, বনিতা, কলত্র, গৃহিণী, গিন্নী
পাখি	পক্ষী, খেচর, বিহগ, বিহঙ্গ, বিহঙ্গম, পতঙ্গী, খগ, অণ্ডজ, শকুন্ত, দ্বিজ
ফুল	পুষ্প, কুসুম, প্রসূন, রঙ্গন
বৃক্ষ	গাছ, শাখী, বিটপী, অটবি, দ্রুম, মহীরুহ, তরু, পাদপ
বন	অরণ্য, জঙ্গল, কানন, বিপিণ, কুঞ্জ, কান্তার, অটবি, বনানী, গহন
বায়ু	বাতাস, অনিল, পবন, হাওয়া, সমীর, সমীরণ, মারুত, গন্ধবহ
বিদ্যুত	বিজলী, ত্বড়িৎ, ক্ষণপ্রভা, সৌদামিনী, চপলা, চঞ্চলা, দামিনী, অচিরপ্রভা, শম্পা
মানুষ	মানব, মানুষ, লোক, জন, নৃ, নর,
মাটি	ক্ষিতি, মৃত্তিকা,
মেঘ	জলধর, জীমূত, বারিদ, নীরদ, পয়োদ, ঘন, অম্বুদ, তায়দ, পয়োধর, বলাহক, তোয়ধর
রাজা	নরপতি, নৃপতি, ভূপতি, বাদশাহ
রাত	রাত্রি, রজনী, নিশি, যামিনী, শবরী, বিভাবরী, নিশা, নিশিথিনী, ক্ষণদা, ত্রিয়ামা
শরীর	দেহ, বিগ্রহ, কায়, কলেবর, গা, গাত্র, তনু, অঙ্গ, অবয়ব
সর্প	সাপ, অহি, আশীবিষ, উরহ, নাগ, নাগিনী, ভূজঙ্গ, ভূজগ, ভূজঙ্গম, সরীসৃপ, ফণী, ফণাধর, বিষধর, বায়ুভুক
স্ত্রী	পত্নী, জায়া, সহধর্মিণী, ভার্যা, বেগম, বিবি, বধূ,
স্বর্ণ	সোনা, কনক, কাঞ্চন, সুবর্ণ, হেম, হিরণ্য, হিরণ
স্বর্ণ	দেবলোক, দ্যুলোক, বেহেশত, সুরলোক, দ্যু, ত্রিদশালয়, ইন্দ্রালয়, দিব্যলোক, জান্নাত
সাহসী	অভীক, নিভীক,
সাগর	সমুদ্র, সিন্ধু, অর্ণব, জলধি, জলনিধি, বারিধি, পারাবার, রত্নাকর, বরুণ, দরিয়া, পারাবার, বারীন্দ্র, পাথার, বারীশ, পয়োনিধি, তোয়ধি, বারিনিধি, অম্বুধি
সূর্য	রবি, সবিতা, দিবাকর, দিনমনি, দিননাথ, দিবাবসু, অর্ক, ভানু, তপন, আদিত্য, ভাস্কর, মার্তণ্ড, অংশু, প্রভাকর, কিরণমালী, অরুণ, মিহির, পুষা, সূর, মিত্র, দিনপতি, বালকি, অর্ষমা
হাত	কর, বাহু, ভূজ, হস্ত, পাণি
হস্তী	হাতি, করী, দন্তী, মাতঙ্গ, গজ, ঐরাবত, দ্বিপ, দ্বিরদ, বারণ, কুঞ্জর, নাগ
লাল	লোহিত, রক্তবর্ণ
ঢেউ	তরঙ্গ, উর্মি, লহরী, বীচি, মওজ



# সমোচ্চারিত শব্দ

এখানে কিছু সমোচ্চারিত শব্দ ও তাদের অর্থ উল্লেখসহ বাক্য রচনা করে দেখানো হলো-

অন্য (অপর) :তাকে অন্য দিন আসতে বলেছি

অন্ন (ভাত) আমরা অন্ন ছাড়া জীবন ধারণ করতে পারি না।

অশ্ব (ঘোড়া) :অশ্ব একটি দ্রুতগামী প্রাণী।

অশ্ব (পাথর) :অশ্ব নিক্ষেপে সর্পটির মস্তক চূর্ণ হইল।

অনু (পশ্চাৎ) :মিথ্যাবাদীর অনুগমন করা উচিত নয়।

অণু (ক্ষুদ্রতম) :এ বিশাল পৃথিবী অণুপরমাণুর সৃষ্টি।

অপচয় (নষ্ট) :কোনো কিছুই অপচয় করা ভালো নয়।

অবচয় (সংগ্রহ) :এ অংশটি কবি সুফিয়া কামালের কবিতা থেকে অবচয়িত হয়েছে।

অবদান (কীর্তি) :রেডিও আবিষ্কারে বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের অবদান রয়েছে।

অবধান (মনোযোগ):গুরুজনের উপদেশ অবধান সহকারে শোনা উচিত।

অবিরাম (অনবরত):দুদিন ধরে অবিরাম বৃষ্টি।

অভিরাম (সুন্দর) :বাংলাদেশের মতো এমন নয়নাভিরাম দৃশ্য আর কোথাও দেখিনি।

অনিষ্ট (ক্ষতি) :পরের অনিষ্ট করতে গেলে নিজের অনিষ্ট হয়।

অনিষ্ট (নিষ্ঠাহীন) :অনিষ্ট ছাত্র জীবনে উন্নতি করতে পারে না।

আপন (নিজ) :সবারই আপন কাজে মন দেওয়া উচিত।

আপণ (দোকান) :শহরে বহর আলির একটি আপণ আছে।

আবাস (বাসস্থান) :লোকটির আবাস অনেক দূরে।

আভাস (ইঙ্গিত) :খেলা দেখার জন্য স্কুল বন্ধ থাকতে পারে বলে রফিক স্যার আভাস দিয়েছেন।

আসার (জলকণা) :আষাঢ়ে মেঘ থেকে আসার নামে।

আষাঢ় (মাস বিশেষ):আষাঢ়শ্রাবণ বর্ষাকাল।

আশা (আকাঙ্ক্ষা) : বেশি আশা করেই ভুল করেছি।

আসা (আগমন) : বাবার আজ স্কুলে আসার কথা।

আবরণ (আচ্ছাদন) :এ আবরণের ভেতরে রহস্য আছে।

আভরণ (অলংকার):মেয়েরা আভরণ পছন্দ করে।

উপাদান (উপকরণ) :বাবা আচারের সব উপাদান এনেছেন।

উপাধান (বালিশ) :উপাধান ছাড়া শোয়া যায় না।

উদ্যত (প্রস্তুত) : লোকটি চলে যেতে উদ্যত হয়েছিল।

উদ্ধত (অবিনীত) :কখনোই উদ্ধত আচরণ করতে নেই।

কমল (পদ্মফুল) :আমাদের দিঘিতে রক্তকমল ফুটেছে।

কোমল (নরম) :শিশুটির হাতখানা খুবই কোমল।

কুল (বংশ) :তিনি উচ্চ কুলে জন্মেছিলেন।

কুল (বরই) :এ গাছের কুল খেতে মজা।

অর্থ এবং বানানে ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও কোনো কোনো শব্দের উচ্চারণ প্রায় একই রকম। এ ধরনের শব্দকে সমোচ্চারিত শব্দ বা প্রায় সমোচ্চারিত শব্দ বলে। যেমন- ‘অন্ন’ এবং ‘অন্য’ শব্দদুটির উচ্চারণ প্রায় একই রকম হলেও এদের বানান এবং অর্থে পার্থক্য আছে। ‘অন্য’ শব্দের অর্থ অপর এবং ‘অন্ন’ শব্দের অর্থ ভাত।

কিছু উদাহরণ-

শর

তীর/তৃণবিশেষ

ধুম

প্রাচুর্য, জাঁকজমক



ষড়	ছয় (৬)	ধূম	ধোঁয়া
সর	দুধের মালাই	সুত	পুত্র
স্বর	শব্দ, সুর	সূত	সারথি, জাত
আবরণ	আচ্ছাদন	শিকার	মৃগয়া
আভরণ	গহনা, অলংকার, ভূষণ	স্বীকার	মেনে নেওয়া, বরণ

অন্ন	ভাত	পড়-পড়	পড়ন্ত
অন্য	অপর	পর পর	একের পর এক
আসা	আগমন	বাণী	কথা, উক্তি
আশা	প্রত্যাশা, ভরসা	বানি	গয়না তৈরির মজুরি
বেশি	অনেক	নিচ	নিম্ন স্থান, বাড়ির নিম্নতল
বেশী	বেশখারী (ছদ্মবেশী)	নীচ	হীন, নিকৃষ্ট
শব	মৃতদেহ	সকল	সব, সমস্ত
সব	সমস্ত	শকল	মাছের আঁশ
কাঁচা	অপক্ব	কাঁটা	কণ্টক
কাচা	ধৌত করা	কাটা	কর্তন
গাঁথা	গেঁথে দেয়া	গাঁ	গ্রাম
গাথা	কাহিনী, কাহিনীকাব্য	গা	শরীর
ঘাঁটি		দাঁড়ি	পূর্ণচ্ছেদ
ঘাটি		দাড়ি	মাঝি
বাঁক	নদী বা পথের বাঁক	বাঁথা	বন্ধন
বাক	কথা	বাখা	প্রতিহত করা, রোধ করা
কাঁদা	ক্রন্দন	গোঁড়া	অন্ধ বা উগ্রভাবে সমর্থনকারী
কাদা	কর্দম	গোড়া	নিচের অংশ
বাঁ	বাম	রোধ	প্রতিরোধ, বাখা দেয়া
বা	অথবা, কিংবা	রোদ	রৌদ্র

বরশা		কুল	তীর, উপকূল
বরষা	বর্ষা, বৃষ্টি	কুল	বরই/জাত
ক্ষুরধার	প্রচণ্ড ধারালো		
ক্ষুরধারা	ক্ষুরের মত ধারালো যে প্রবাহ বা স্রোত		

সাড়া	শব্দ বা ডাকের জবাব, প্রতিক্রিয়া	শোনা	শ্রবণ
সারা	সমগ্র, শেষ, আকুল	সোনা	স্বর্ণ
দেড়ী	দেড়গুণ	জোড়	যুগল
দেরি	বিলম্ব	জোর	বল, শক্তি, সামর্থ্য
পাড়ি	পারাপার		



## বিপরীতার্থক শব্দ / বিপরীত শব্দ

একটি শব্দের বিপরীত অর্থবাচক শব্দকে বিপরীতার্থক শব্দ বা বিপরীত শব্দ বলে।

- সাধারণত শব্দের শুরুতে অ, অন, অনা, অপ, অব, দূর, ন, না, নি, নির প্রভৃতি উপসর্গগুলো যুক্ত করলে শব্দের অর্থ না-বাচক বা নিষেধবোধক অর্থে রূপান্তরিত হয়। তাই শব্দের বিপরীত শব্দ তৈরিতেও এই উপসর্গগুলো ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

যেমন- আগত – শব্দটির শুরুতে অন- উপসর্গটি যুক্ত হয়ে বিপরীত শব্দ হল- অনাগত।

- আবার যে সব শব্দের শুরুতে হ্যাঁ-বোধক উপসর্গ থাকে, তাদের শুরুর সেই উপসর্গের বদলে না-বোধক উপসর্গও ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

যেমন- অনুরাগ- শব্দটি রাগ- শব্দমূলের পূর্বে অনু- উপসর্গ যুক্ত হয়ে গঠিত হয়েছে, যেখানে অনু- উপসর্গটি ইতিবাচক অর্থ প্রকাশ করেছে। এখন অনু-র পরিবর্তে বি- উপসর্গ ব্যবহার করলে, বিরাগ- শব্দে বি-উপসর্গটি নেতিবাচক অর্থ প্রকাশ করে, এবং শব্দটির অর্থ সম্পূর্ণ উল্টে যায়। অর্থাৎ, ইতিবাচক অনু- উপসর্গের বদলে নেতিবাচক বি-উপসর্গের ব্যবহারে বিপরীত শব্দ গঠিত হল।

- তবে সাধারণত, শব্দের বিপরীত শব্দগুলো অর্থের দিক থেকে বিপরীত অর্থবোধক হয়; না-বোধক বা নেতিবাচক হয় না। তাই, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরকম কোন নিয়ম খাটে না। বরং অর্থের দিক থেকে যথাযথ বিপরীত শব্দটিই গৃহীত হয়।

যেমন- আজ – কাল, অতীত- ভবিষ্যত, অধম- উত্তম, ইত্যাদি।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিপরীত শব্দ

অ

অকর্মক	সকর্মক	অজ্ঞ	প্রাজ্ঞ	অধিত্যকা	উপত্যকা
অক্ষম	সক্ষম	অতিকায়	ক্ষুদ্রকায়	অনন্ত	সান্ত
অগ্র	পশ্চাৎ	অতিবৃষ্টি	অনাবৃষ্টি	অনুকূল	প্রতিকূল
অগ্রজ	অনুজ	অতীত	ভবিষ্যত	অনুগ্রহ	নিগ্রহ
অণু	বৃহৎ	অদ্য	কল্য	অগ্রজ	অনুজ
অচল	সচল	অধঃ	ঊর্ধ্ব	অনুরক্ত	বিরক্ত
অচলায়তন	সচলায়তন	অধম	উত্তম	অনুরাগ	বিরাগ
অচেতন	সচেতন	অধমর্গ	উত্তমর্গ	অনুলোম	প্রতিলোম
অলীক	সত্য	অশন	অনশন	অন্তগামী	উদীয়মান
অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অসীম	সসীম	অস্তি	নাস্তি / নেতি
অহিংস	সহিংস				

আ

আকর্ষণ	বিকর্ষণ	আধার	আধেয়	আরোহণ	অবরোহণ
আকুঞ্চন	প্রসারণ	আপদ	সম্পদ	আর্দ্র	শুষ্ক
আগত	অনাগত	আবশ্যক	অনাবশ্যক	আর্থ	অনার্থ
আগমন	প্রস্থান	আবশ্যিক	ঐচ্ছিক	আলস্য	শ্রম
আজ	কাল	আবাদি	অনাবাদি	আলো	আঁধার
আত্ম	পর	আবাহন	বিসর্জন	আশীর্বাদ	অভিশাপ
আত্মীয়	অনাত্মীয়	আবির্ভাব	তিরোভাব	আসক্ত	নিরাসক্ত
আদি	অন্ত	আবির্ভূত	তিরোহিত	আসামি	ফরিয়াদী



আদিম	অন্তিম	আবিল	অনাবিল	আস্তিক	নাস্তিক
আদ্য	অন্ত্য	আবৃত	উন্মুক্ত	আস্থা	অনাস্থা
ই					
ইচ্ছুক	অনিচ্ছুক	ইদানীন্তন	তদানীন্তন	ইহকাল	পরকাল
ইতর	ভদ্র	ইষ্ট	অনিষ্ট	ইহলোক	পরলোক
ইতিবাচক	নেতিবাচক			ইহলৌকিক	পারলৌকিক
ঈ					
ঈদৃশ	তাদৃশ		ঈষৎ	অধিক	
উ					
উক্ত	অনুক্ত	উত্তরায়ণ	দক্ষিণায়ন	উন্নত	অবনত
উগ্র	সৌম্য	উত্তাপ	শৈত্য	উন্নতি	অবনতি
উচ্চ	নীচ	উত্তীর্ণ	অনুত্তীর্ণ	উন্নীত	অবনমিত
উজান	ভাটি	উত্থান	পতন	উন্নয়ন	অবনমন
উঠতি	পড়তি	উথিত	পতিত	উন্মুখ	বিমুখ
উঠন্ত	পড়ন্ত	উদয়	অস্ত	উন্মীলন	নিমীলন
উৎকৃষ্ট	নিকৃষ্ট	উদ্ধত	বিনীত/ নম্র	উপকর্ষ	অপকর্ষ
উৎকর্ষ	অপকর্ষ	উদ্বৃত্ত	ঘাটতি	উপচয়	অপচয়
উৎরাই	চড়াই	উদ্যত	বিরত	উপকারী	অপকারী
উত্তম	অধম	উদ্যম	বিরাম	উপকারিতা	অপকারিতা
উত্তমর্গ	অধমর্গ	উর্বর	ঊষর	উপচিকীর্ষা	অপচিকীর্ষা
উত্তর	দক্ষিণ	ঊষঃ	শীতল		
ঊ					
ঊর্ধ্ব	অধঃ	ঊর্ধ্বগতি	অধোগতি	ঊষা	সন্ধ্যা
ঊর্ধ্বতন	অধস্তন	ঊর্ধ্বগামী	অধোগামী	ঊষর	উর্বর
ঋ					
ঋজু		বক্র			
এ					
একান্ন	পৃথগান্ন	একাল	সেকাল	একূল	ওকূল
		এখন	তখন		
ঐ					
ঐকমত্য	মতভেদ	ঐশ্বর্য	দারিদ্র্য	ঐহিক	পারত্রিক
ঐক্য	অনৈক্য				
ও					
ওস্তাদ		সাকরেদ			
ঔ					
ঔদার্য	কার্পণ্য	ঔচিত্য	অনৌচিত্য	ঔজ্জ্বল্য	ম্লানিমা
ঔদ্ধত্য	বিনয়				
ক					



কচি	ঝুনা	কুৎসিত	সুন্দর	কৃশাঙ্গী	স্থূলাঙ্গী
কদাচার	সদাচার	কুফল	সুফল	কৃষ্ণ	শুভ্র/গৌর
কনিষ্ঠ	জ্যেষ্ঠ	কুবুদ্ধি	সুবুদ্ধি	কৃষ্ণাঙ্গ	শ্বেতাঙ্গ
কপট	সরল/অকপট	কুমেরু	সুমেরু	কোমল	কঠিন
কপটতা	সরলতা	কুরুচি	সুরুচি	ক্রন্দন	হাস্য
কর্মঠ	অকর্মণ্য	কুলীন	অন্ত্যজ	ক্রোধ	প্ৰীতি
কল্পনা	বাস্তব	কুশাসন	সুশাসন	ক্ষণস্থায়ী	দীর্ঘস্থায়ী
কাপুরুষ	বীরপুরুষ	কুশিক্ষা	সুশিক্ষা	ক্ষীপ্র	মহুর
কুঞ্চন	প্রসারণ	কৃতজ্ঞ	অকৃতজ্ঞ/কৃতঘ্ন	ক্ষীয়মান	বর্ধমান
কুটিল	সরল	কৃপণ	বদান্য		
কুৎসা	প্রশংসা	কৃশ	স্থূল		

খ্যাত	অখ্যাত	খুচরা	পাইকারি	খেদ	হর্ষ
খ্যাতি	অখ্যাতি				

গঞ্জনা	প্রশংসা	গূঢ়	ব্যক্ত	গৌণ	মুখ্য
গতি	স্থিতি	গুপ্ত	প্রকাশিত	গৌরব	অগৌরব
গদ্য	পদ্য	গৃহী	সন্ন্যাসী	গ্রামীণ	নাগরিক
গণ্য	নগণ্য	গ্রহণ	বর্জন	গ্রাম্য	শহুরে
গরল	অমৃত	গৃহীত	বর্জিত	গ্রাহ্য	অগ্রাহ্য
গরিমা	লঘিমা	গেঁয়ো	শহুরে		
গরিষ্ঠ	লঘিষ্ঠ	গোপন	প্রকাশ		

ঘাটতি	বাড়তি	ঘাত	প্রতিঘাত	ঘৃণা	শ্রদ্ধা
-------	--------	-----	----------	------	---------

চক্ষুস্থান	অন্ধ	চল	অচল	চিরায়ত	সাময়িক
চঞ্চল	স্থির	চলিত	অচলিত/সাধু	চ্যুত	অচ্যুত
চড়াই	উৎরাই	চিন্তনীয়	অচিন্ত্য/অচিন্তনীয়		
চতুর	নির্বোধ	চুনোপুটি	কুই-কাতলা		

ছটফটে	শান্ত
-------	-------

জঙ্গম	স্বাবর	জল	স্থল	জোড়	বিজোড়
জড়	চেতন	জলে	স্থলে	জোয়ার	ভাটা
জটিল	সরল	জলচর	স্থলচর	জ্যোৎস্না	অমাবস্যা
জনাকীর্ণ	জনবিরল	জাতীয়	বিজাতীয়	জ্ঞাত	অজ্ঞাত
জন্ম	মৃত্যু	জাল	আসল	জ্ঞানী	মূর্খ





জমা	খরচ	জিন্দা	মুদা	জোয়	অজোয়
জরিমানা	বকশিশ	জীবন	মরণ	জ্যেষ্ঠা	কনিষ্ঠা
জাগ্রত	ঘুমন্ত/সুপ্ত	জীবিত	মৃত		
জাগরণ	ঘুম/সুপ্ত	জৈব	অজৈব		

ঠ

ঠুনকো মজবুত

ড

ডুবন্ত ভাসন্ত

ত

তদীয়	মদীয়	তারুণ্য	বার্থক্য	তীক্ষ্ণ	স্থূল
তন্ময়	মন্ময়	তিমির	আলোক	তীব্র	মৃদু
তস্কর	সাধু	তিরস্কার	পুরস্কার	তুট্ট	কুট্ট
তাপ	শৈত্য	তীর্থক	ঋজু	ত্বরিত	শ্লথ

দ

দক্ষিণ	বাম	দুর্জন	সুজন	দৃঢ়	শিথিল
দণ্ড	পুরস্কার	দুর্দিন	সুদিন	দৃশ্য	অদৃশ্য
দাতা	গ্রহীতা	দুর্নাম	সুনাম	দেনা	পাওনা
দিবস	রজনী	দুর্ভিক্ষ	সুর্ভিক্ষ	দেশী	বিদেশী
দিবা	নিশি/রাত্রি	দুর্ভাগ্য	সৌভাগ্য	দোষ	গুণ
দিবাকর	নিশাকর	দুর্মতি	সুমতি	দোষী	নির্দোষ
দীর্ঘ	হ্রস্ব	দুর্লভ	সুলভ	দোস্ত	দুশমন
দীর্ঘায়ু	স্বল্পায়ু	দুষ্কৃতি	সুকৃতি	দ্বিধা	নির্দ্বিধা/দ্বিধাহীন
দুঃশীল	সুশীল	দুষ্ট	শিষ্ট	দ্বৈত	অদ্বৈত
দুরন্ত	শান্ত	দূর	নিকট	দ্যুলোক	ভূলোক
দুর্গম	সুগম	দ্রুত	মন্হর		

ধ

ধনাঅক	ঋণাঅক	ধারালো	ভোঁতা	ধূর্ত	বোকা
ধনী	নির্ধন/দরিদ্র	ধার্মিক	অধার্মিক	ধৃত	মুক্ত
ধবল	শ্যামল				

ন

নতুন	পুরাতন	নিন্দা	জাগরণ	নির্মল	মলিন
নবীন	নিন্দিত	নিয়োগ	বরখাস্ত	নির্লজ্জ	সলজ্জ
নবীন	প্রবীণ	নিরক্ষর	সাক্ষর	নিশ্চয়তা	অনিশ্চয়তা
নর	নারী	নিরবলম্ব	স্বাবলম্ব	নীরস	সরস
নশ্বর	অবিনশ্বর	নিরস্ত্র	সশস্ত্র	নিশ্চেষ্ট	সচেষ্ট
নাবালক	সাবালক	নিরাকার	সাকার	নৈঃশব্দ্য	সশব্দ
নিঃশ্বাস	প্রশ্বাস	নির্দয়	সদয়	নৈতিকতা	অনৈতিকতা



নিকৃষ্ট নিত্য	উৎকৃষ্ট অনিত্য	নির্দিষ্ট নির্দেশক	অনির্দিষ্ট অনির্দেশক	নৈসর্গিক ন্যায় ন্যূন	কৃত্রিম অন্যায় অধিক
প					
পক্ষ	বিপক্ষ	পূণ্যবান	পূণ্যহীন	প্রফুল্ল	ম্লান
পটু	অপটু	পুরস্কার	তিরস্কার	প্রবীণ	নবীন
পণ্ডিত	মূর্খ	পুষ্ট	ক্ষীণ	প্রবেশ	প্রস্থান
পতন	উত্থান	পূর্ণিমা	অমাবস্যা	প্রভু	ভৃত্য
পথ	বিপথ	পূর্ব	পশ্চিম	প্রশ্বাস	নিঃশ্বাস
পবিত্র	অপবিত্র	পূর্ববর্তী	পরবর্তী	প্রসন্ন	বিষন্ন
পরকীয়	স্বকীয়	পূর্বসূরী	উত্তরসূরী	প্রসারণ	সংকোচন/আকুঞ্চন
পরার্থ	স্বার্থ	পূর্বাহ্ন	অপরাহ্ন	প্রাচ্য	প্রতীচ্য
পরিকল্পিত	অপরিকল্পিত	প্রকাশিত	অপ্রকাশিত	প্রাচীন	অর্বাচীন
পরিশোধিত	অপরিশোধিত	প্রকাশ	গোপন	প্রতিকূল	অনুকূল
পরিশ্রমী	অলস	প্রকাশ্যে	নেপথ্যে	প্রায়শ	কদাচিৎ
পাপ	পুণ্য	প্রজ্জ্বলন	নির্বাপণ	প্রারম্ভ	শেষ
পাপী	নিষ্পাপ	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	প্রীতিকর	অপ্রীতিকর
পার্থিব	অপার্থিব	প্রধান	অপ্রধান		
ফ					
ফলস্ত/ফলনশীল		নিষ্ফলা	ফলবান	নিষ্ফল	ফাঁপা নিরেট
ব					
বক্তা	শ্রোতা	বাধ্য	অবাধ্য	বিফল	সফল
বন্দনা	গঞ্জনা	বামপন্থী	ডানপন্থী	বিফলতা	সফলতা
বন্দী	মুক্ত	বাস্তব	কল্পনা	বিবাদ	সুবাদ
বন্ধ	মুক্ত	বাল্য	বার্থক্য	বিয়োগান্ত	মিলনান্ত
বন্ধন	মুক্তি	বাহুল্য	স্বল্পতা	বিয়োগান্তক	মিলনান্তক
বন্ধুর	মসৃণ	বাহ্য	আভ্যন্তর	বিরহ	মিলন
বন্য	পোষা	বিজেতা	বিজিত	বিলম্বিত	দ্রুত
বয়োজ্যেষ্ঠ	বয়োকনিষ্ঠ	বিদ্বান	মূর্খ	বিষাদ	আনন্দ/হর্ষ
বরখাস্ত	বহাল	বিধর্মী	স্বধর্মী	বিস্তৃত	সংক্ষিপ্ত
বর্ধমান	ক্ষীয়মান	বিনয়	ঔদ্ধত্য	ব্যক্ত	গুপ্ত
বর্ধিষ্ণু	ক্ষয়িষ্ণু	বিনীত	উদ্ধত	ব্যর্থ	সার্থক
বহির্ভূত	অন্তর্ভূত	বিপন্ন	নিরাপদ	ব্যর্থতা	সার্থকতা
বাদি	বিবাদি	বিপন্নতা	নিরাপত্তা	ব্যষ্টি	সমষ্টি
ভ					
ভক্তি	অভক্তি	ভাটা	জোয়ার	ভূত	ভবিষ্যত
ভদ্র	ইতর	ভাসা	ডোবা	ভূমিকা	উপসংহার

ভীৰু	নিভীক	ভোগ	ত্যাগ	ভেদ	অভেদ
ম					
মঙ্গল	অমঙ্গল	মহাত্মা	দুরাত্মা	মুক্ত	বন্দী
মঞ্জুর	নামঞ্জুর	মানানসই	বেমানান	মুখ্য	গৌণ
মতৈক্য	মতানৈক্য	মান্য	অমান্য	মূৰ্খ	জ্ঞানী
মসৃণ	খসখসে	মিতব্যয়ী	অমিতব্যয়ী	মূৰ্ত	বিমূৰ্ত
মহৎ	নীচ	মিথ্যা	সত্য	মৌখিক	লিখিত
মহাজন	খাতক	মিলন	বিরহ	মৌলিক	যৌগিক
য					
যত্ন	অযত্ন	যুদ্ধ	শান্তি	যৌথ	একক
যশ	অপযশ	যোগ	বিয়োগ	যৌবন	বার্ধক্য
যুক্ত	বিযুক্ত	যোগ্য	অযোগ্য		
যুগল	একক	যোজন	বিয়োজন		
র					
রক্ষক	ভক্ষক	রাজি	নারাজ	রোদ	বৃষ্টি
রমণীয়	কুৎসিত	রুগ্ন	সুস্থ	রোগী	নিরোগ
রসিক	বেরসিক	রুদ্ধ	মুক্ত		
রাজা	প্রজা	রুষ্ট	তুষ্ট		
ল					
লঘিষ্ঠ	গরিষ্ঠ	লাজুক	নির্লজ্জ	লেন	দেন
লঘু	গুরু	লেজ	মাথা	লেনা	দেনা
লব	হর	লৌকিক	অলৌকিক		
শ					
শঠ	সাধু	শিষ্ট	অশিষ্ট	শুষ্ক	সিক্ত
শঠতা	সাধুতা	শিষ্য	গুরু	শূণ্য	পূর্ণ
শায়িত	উত্থিত	শীত	গ্রীষ্ম	শোভন	অশোভন
শয়ন	উত্থান	শীতল	উষ্ণ	শ্বাস	প্রশ্বাস
শারীরিক	মানসিক	শুরূপক্ষ	কৃষ্ণপক্ষ	শ্রী	বিশ্রী
শালীন	অশালীন	শুচি	অশুচি	শ্রীল	অশ্রীল
শাসক	শাসিত	শুদ্ধ	অশুদ্ধ		
শিক্ষক	ছাত্র	শুভ্র	কৃষ্ণ		
স					
সংকীর্ণ	প্রশস্ত	সদৃশ	বিসদৃশ	সাহসিকতা	ভীৰুতা
সংকোচন	প্রসারণ	সধবা	বিধবা	সিক্ত	শুষ্ক
সংকুচিত	প্রসারিত	সন্ধি	বিগ্রহ	সুকৃতি	দুষ্কৃতি
সংক্ষিপ্ত	বিস্তৃত	সন্নিধান	ব্যবধান	সুগম	দুর্গম
সংক্ষেপ	বিস্তার	সফল	বিফল	সুন্দর	কুৎসিত



সংক্ষেপিত	বিস্তারিত	সবল	দুর্বল	সুদর্শন	কুদর্শন
সংগত	অসংগত	সবাক	নির্বাক	সুখা	জাগ্রত
সংযত	অসংযত	সমতল	অসমতল	সুপ্ত	জাগ্রত
সংযুক্ত	বিযুক্ত	সমষ্টি	ব্যষ্টি	সুয়ো	দুয়ো
সংযোগ	বিয়োগ	সমাপিকা	অসমাপিকা	সুশীল	দুঃশীল
সংযোজন	বিয়োজন	সমাপ্ত	আরম্ভ	সুশ্রী	কুশ্রী
সংশ্লিষ্ট	বিশ্লিষ্ট	সম্পদ	বিপদ	সুষম	অসম
সংশ্লেষণ	বিশ্লেষণ	সম্প্রসারণ	সংকোচন	সুসহ	দুঃসহ
সংহত	বিভক্ত	সম্মুখ	পশ্চাত	সুস্থ	দুস্থ
সংহতি	বিভক্তি	সরব	নিরব	সূক্ষ্ম	স্থূল
সকর্মক	অকর্মক	সরল	কুটিল/জটিল	সৃষ্টি	ধ্বংস
সকাল	বিকাল	সশস্ত্র	নিরস্ত্র	সৌখিন	পেশাদার
সক্রিয়	নিষ্ক্রিয়	সস্তা	আক্রা	সৌভাগ্যবান	দুর্ভাগ্যবান/ভাগ্যহত
সক্ষম	অক্ষম	সসীম	অসীম	স্তুতি	নিন্দা
সচল	নিশ্চল	সহযোগ	অসহযোগ	স্তাবক	নিন্দুক
সচেতন	অচেতন	সহিষ্ণু	অসহিষ্ণু	স্বাবর	জঙ্গম
সচেষ্ট	নিশ্চেষ্ট	সাঁঝ	সকাল	স্থলভাগ	জলভাগ
সচ্চরিত্র	দুশ্চরিত্র	সাকার	নিরাকার	স্নিগ্ধ	রক্ষ
সজাগ	নিদ্রিত	সাক্ষর	নিরক্ষর	স্বনামী	বেনামী
সজ্জন	দুর্জন	সাদৃশ্য	বৈসাদৃশ্য	স্বর্গ	নরক
সজ্ঞান	অজ্ঞান	সাফল্য	ব্যর্থতা	স্বাতন্ত্র্য	সাধারণত্ব
সঞ্চয়	অপচয়	সাবালক	নাবালক	স্বাধীন	পরাস্বীন
সতী	অসতী	সাবালিকা	নাবালিকা	স্বার্থপর	পরার্থপর
সত্বর	ধীর	সাম্য	বৈষম্য	স্মৃতি	বিস্মৃতি
সদয়	নির্দয়	সার	অসার	স্থির	অস্থির
সদর	অন্দর	সার্থক	নিরর্থক		
সদাচার	কদাচার	সাহসী	ভীরু		

হ

হরণ	পূরণ	হাল	সাবেক	হৃদ্যতা	শত্রুতা
হর্ষ	বিষাদ	হালকা	ভারি	হ্রস্ব	দীর্ঘ
হাজির	গরহাজির	হিত	অহিত	হ্রাস	বৃদ্ধি
হার	জিত	হিসেবি	বেহিসেবি		

## প্রয়োজনীয় কিছু শুদ্ধ বানান

চাকরি, সাক্ষী, সাক্ষ্য, এতদ্বারা, এতদসংক্রান্ত, উপর্যুক্ত/উপরিউক্ত, উল্লিখিত, ইতোমধ্যে, ইতঃপূর্বে, পশ্চিমধ্যে, সুষ্ঠু, অদ্যাবধি,



/ExamKaDarrNahi



/info\_EKDN



8276808358

যথাবিহিত, আকাঙ্ক্ষা, কাঙ্ক্ষিত, দাবি, জারি, সেবা, পরিষেবা, স্বচ্ছ, সচ্ছল, দ্বন্দ্ব, দূর, দূর-দূরান্ত, দূরীকরণ, অদূর, দূরত্ব, দূরবীক্ষণ, দূরবিন, দূষিত, দূষণ, দূষণীয়, দুর্গা, দুর্গ, দুর্দান্ত, দুর্বস্থা, দুর্বল, দুর্নীতি, দুর্যোগ, দুর্ঘটনা, দুর্নাম, দুর্ভোগ, দুর্ভাঙ্গা, দুর্দিন, দুর্বল, দুর্জয়, দুর্ভাগ্য, দুর্কহ, ভুবন, ভূমি, অদ্ভুত, ভুতুড়ে, ভস্মীভূত, ভূত, বহির্ভূত, ভূতপূর্ব, ভূমিকা, ভূমিষ্ঠ, ভূয়সী, ভুক্ত, ভুক্তি, ভুল, ভুয়া, মুহূর্ত, মুমূর্ষু, বিদ্যা, বিদ্বান, উচিত, ফেরত, ফেরতযোগ্য, জগৎ, জগতে, বিদ্যুৎ, বিদ্যুতে, ভবিষ্যৎ, ভবিষ্যতে, আত্মসাৎ, আত্মসাতে, যাবৎ, সাক্ষাৎ, সাক্ষাৎকার, সাক্ষাতে, পাইকারি, সরকারি, দরকারি, তরকারি, মস্কারি, সহকারী, আবেদনকারী, সাহায্যকারী, পরিবেশনকারী, দর্শনকারী, তদারককারী, দুষ্টকারী, অনিষ্টকারী, অনুসারী, কর্মচারী, প্রতীকী, যাত্রী, ছাত্রী, ধনী, মীমাংসা, মনীষী, সীমা, সীমাহীন, ইদানীং, তদানীং, সমীচীন, সর্বাঙ্গীণ, গোষ্ঠী, ঋণগ্রহীতা, লক্ষ্মী, হীরা, হীরক, নীল, সুনীল, নীলা, নীলক, নীলিমা, সজীব, রাজীব, রবীন্দ্র, নারায়ণ, যক্ষা, পৈতৃক, অমাবস্যা, ধরন, ধারণ দরুন, দারুণ, ঊর্ধ্ব, ঊর্ধ্বতন, স্তূপ, অত্যন্ত, অত্যধিক, অধ্যয়ন, ব্যাকরণ, গগন, প্রাঙ্গণ, সান্ধ্বনা, সর্বস্বান্ত, শীতাত, সদ্যোজাত, অগ্রিম, নিখুঁত, ব্যাহত, অব্যাহত, অব্যাহতি, একমুখী, দ্বিমুখী, ত্রিমুখী, বহুমুখী, মুখোমুখি, পায়রা, যাবজ্জীবন, উজ্জীবিত, গরিব, রূপা, রূপালি, রূপ, রূপান্তর, রূপান্তরিত, স্বরূপ, রূপসী, কার্যাবলি, শর্তাবলি, ব্যাখ্যাবলি, নিয়মাবলি, তথ্যাবলি, জরুরি, বদলি, মেয়াদি, মঞ্জুরি, মজুরি, কারিগরি, আমদানি, রফতানি/রপ্তানি, জ্বালানি, নতুন, নূতন, পুনঃপ্রকাশ, পুনঃপরীক্ষা, পুনঃপ্রবেশ, পুনঃপ্রতিষ্ঠা, পুনর্জীবিত, পুনর্নিয়োগ, পুনর্নির্মাণ, পুনর্মিলন, পুনর্লাভ, পুনর্মুদ্রিত, পুনর্বিচার, পুনর্বিবেচনা, পুনর্গঠন, পুনর্বাসন, পুনরুদ্ধার, পুনরাবৃত্তি, পুনরুক্তি, মূর্থ, খাস, অগ্রহায়ণ, পুষ্করিণী, শাস্ত, শশুর, শাশুড়ি, মনোযোগ, শিরশ্ছেদ, অঞ্জলি, গীতাঞ্জলি, শ্রদ্ধাঞ্জলি, রাত্রি, অপরাহ্ন (৭), পূর্বাহ্ন (৭), মধ্যাহ্ন (৭), সায়াহ্ন (৭), অভ্যস্ত, আশ্বস্ত, স্বস্তি, অশ্বস্তি, বাধাগ্রস্ত, ক্ষতিগ্রস্ত, হতাশাগ্রস্ত, বিপদগ্রস্ত, নিকটস্থ, দ্বারস্থ, মুখস্থ, কণ্ঠস্থ, মঞ্চস্থ, পদস্থ, অপদস্থ, সুস্থ, দুস্থ, পুরস্কার, পুরস্কৃত, তিরস্কার, নমস্কার, ভাস্কর, আবিষ্কার, দুষ্কর, বহিষ্কৃত, বহিষ্কার, নিষ্কাশন, নিষ্পাপ, নিষ্পত্তি, মস্তিষ্ক, সরকারি, বেসরকারি, বাড়ি, গাড়ি, শাড়ি, আসামি, আইনি, বেআইনি, ইরানি, জাপানি, ইংরেজি, হিন্দি, পাঞ্জাবি, কাশ্মিরি, আরবি, ফারসি, হিজরি, মালি, পাগলামি, ফরিয়াদি, দিঘি, নানি, দাদি, মামি, চাচি, মাসি, দিদি, রেশমি, পশমি, সূচি, সূচিপত্র, কর্মসূচি, সরণি, পদবি, পঞ্জি, অঙ্ক, অঙ্কন, অঙ্কিত, অঙ্কুর, অঙ্গ, অঙ্গন, আকাঙ্ক্ষা, আঙুল/আঙুল, আশঙ্কা, ইঙ্গিত, উলঙ্গ, কঙ্কর, কঙ্কাল, কুসুম, গঙ্গা, চোঙ্গা/চোঙা, টাঙ্গা, ঠোঙ্গা/ঠোঙা, দাঙ্গা, পঙ্ক্তি, পঙ্কজ, পঙ্ক, পতঙ্গ, প্রাঙ্গণ, প্রসঙ্গ, বঙ্গ, বাঙালি/বাজালি, ভঙ্গ, ভঙুগুর, ভাঙ্গা/ভাঙা, মঙ্গল, রঙ্গিন/রঙিন, লঙ্কা, লঙ্গরখানা, লঙ্ঘন, লিঙ্গ, শঙ্কা, শঙ্ক, শঙ্খ, শঙ্খ, শৃঙ্খল, শৃঙ্গ, সঙ্গ, সঙ্গী, সঙ্ঘাত, সঙ্গে, হাঙ্গামা, হুঙ্কার, স্বাতন্ত্র্য/স্বতন্ত্র/স্বতন্ত্রতা, দারিদ্র্য/দরিদ্র/দরিদ্রতা, বাল্মীকি, ত্রিনয়ন, প্রণয়ন, উচ্ছ্বাস, সত্বর, চত্বর, তত্বেবধায়ক, তত্বেবধান, আয়ত্ত, তত্ব, উপাত্ত, সত্তা, ব্যক্তিসত্তা, জাতিসত্তা, মানবসত্তা, অন্তঃসত্ত্বা, সত্তেত্ত্ব, স্বত্বাধিকার, স্বার্থায়েষী, বাঞ্ছিতগুণ, শরণার্থী, শরণাপন্ন, একাকী, একাকিত্ব, শাড়ি, লুঙ্গি, উচ্ছ্বাল, মনোনীত, কীর্তন, রজনী, ব্যতীত, ব্যতিক্রম, ব্যতিরেকে, চাকরিজীবী, পেশাজীবী, কর্মজীবী, আইনজীবী, শ্রমজীবী, জীবিকা, জীবিত, মন্ত্রী, মন্ত্রিত্ব, মন্ত্রিসভা, মন্ত্রিপরিষদ, শ্রেণিকক্ষ, প্রাণী, প্রাণিবিদ্যা, প্রাণিতত্ত্ব, প্রাণিজগৎ, প্রাণিসম্পদ, মহৎ, মহত্ব, মনুষ্যত্ব, পশুত্ব, দেবত্ব, ধর্মত, কার্যত, ন্যায়ত, করত, বস্তুত, ক্রমশ, প্রায়শ, হতভম্ব, মুরঝি, ভিড়, পচা, পঞ্চাশ, পাঁচ, পঁচিশ, পঁয়ত্রিশ, সাঁইত্রিশ, পঁয়তাল্লিশ, পঁয়ষট্টি, পঁচাত্তর, পঁচাশি, পঁচানব্বই, আঁকাবাঁকা, রেস্টোরাঁ, চাঁদ, ছোঁয়া, দাঁত, ঠোঁট, ফাঁক, শুঁড়, কাঁকরোল, আঁতুর, ঝাঁকুনি, ফাঁদ, ইঁদুর, টেঁড়স, তেঁতুল, পুঁইশাক, পেঁপে, কুঁজ, পুঁজ, স্যাঁতস্যাঁতে, খাঁধা, ষাঁড়, উঁচু, বাঁশ, কাঁঠাল, কাঁচা, আঁশ, গুঁড়া, আঁধার, বাঁধাই, দুঃসহ, দুঃসময়, দুর্বিষহ, মৌসুমি, আভিজাত্য, আলস্য, সামর্থ্য, আতিথ্য, আধিক্য, কৌলীন্য, শৈথিল্য, বৈশিষ্ট্য, দৈর্ঘ্য, অর্ঘ্য, শৌর্য, সৌন্দর্য, কার্য, সূর্য, আশ্চর্য, হীনম্মন্যতা, মারপ্যাঁচ/মারপেঁচ, মনোমালিন্য, মরুদ্যান, ভূগোল, ভৌগোলিক, ভবিষ্যদ্বাণী, গৃহিণী, সদ্যবহার, এফুনি, ইসলামি, হজ, আলহাজ, তফসিল, সালিস, আসসালামু আলাইমুক, শাহাদত, শামস, সালাম, সালাত, সানা, সফর, কিসমত, ইহসান, ইনসান, ইনসাফ, নসিব, মুসল্লি, মুসাফির, ক্লাস, গ্লাস, গ্রিন, গ্রিক, গ্রিস, ব্রিটিশ, ব্রিটেন, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, রিকশা, অটোরিকশা, ক্রাইস্ট, খ্রিষ্ট, খ্রিষ্টীয়, যিশুখ্রিষ্ট, খ্রিষ্টান্দ, খ্রিষ্টান, মোটরসাইকেল, ডিগ্রি, চিফ, শিট, শিপ, নমিনি, কিডনি, ফ্রি, স্কিন, স্কিন, স্কলারশিপ, পার্টনারশিপ, ফ্রেন্ডশিপ, সুপারিনটেনডেন্ট, শেক্সপিয়র, স্টেশনারি, নোটারি, লটারি, সেক্রেটারি, টেরিটরি, ক্যাটাগরি, ট্রেজারি, ব্রিজ, প্রাইমারি, মার্কেটিং, গ্রেডশিট, কি-বোর্ড, গিয়ার, লিডার, লিড, লিপ-ইয়ার, লিজ, নিট, রিড, রিডার, সিট, সি-বিচ, ড্রিম, স্পিকার, টিয়ার, ডিন, সিল, টিচার, টি, বিউটি, প্লিজ, রিলিজ, টিম, ক্রিম, আইসক্রিম, স্টিমার, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, সমিল (করাতকল), প্রিন্ট, স্টোর, স্টাফ, স্টার, ইনস্টিটিউট, বাসস্ট্যান্ড, ফটোস্ট্যাট, হর্ন, কর্নার, পর্নো, পর্নোগ্রাফি, মডার্ন, এশিয়ান, এশীয়, ইউরোপিয়ান, ইউরোপীয়, ইটালিয়ান, ইতালীয়, কোরিয়ান, কোরীয়, স্পেনিশ, স্পেনীয়, মিসরীয় ইত্যাদি।

=> যেসব বানান ভেঙে দেওয়া হয়েছে— মাদ্রাসা>মাদরাসা, ফর্ম> ফরম, কর্পোরেশন>করপোরেশন, পেন্সিল>পেনসিল, আব্দুল>আবদুল, আব্দুস> আবদুস, আব্দুর>আবদুর ইত্যাদি।

=> সামাজিক যোগাযোগভিত্তিক সাইটগুলোতে ব্যবহৃত কিছু শুদ্ধ বানান— ব্লগিং, ব্লগীয়, পেজ, ফেসবুক, পোস্ট, স্টিক, রি-পোস্ট,



ট্যাগ, মিস ইত্যাদি।

=> অ-তৎসম শব্দ অনুযায়ী দেশি, বিদেশি, বাংলাদেশি, শ্রেণি, পল্লি, নবি, মহানবি, শহিদ, প্রণালি, নির্বাচনি, বহুনির্বাচনি, নবাবি বানানগুলো পরিবর্তন হয়েছে।

www.examkadarrahi.tk



/ExamKaDarrNahi



/info\_EKDN



8276808358